প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা ১৪২৬

প্রবাস বন্ধু

১৪২৬ নববর্ষ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (হিউস্টন, টেক্সাস)	3
গদ্য		
বাংলা সাহিত্য ও হিউস্টনের সাহিত্য সভা - পঞ্চাশ বছর পর	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	4
একটি আশ্চর্য মামলা	শেলী শাহাবুদ্দিন (মাউন্টেন ভিউ, ক্যালিফোর্নিয়া)	6
খাদ্য ও খাবার নিয়ম	ভজেন্দ্র বর্মন (হিউস্টন, টেক্সাস)	10
অনুমান	পুষ্পা সাক্সেনা অনুবাদ: সুজয় দত্ত (ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও)	12
আগে মানুষ তারপর অন্য কিছু	বলাকা ঘোষাল (হিউস্টন, টেক্সাস)	31
বড়মা	কৃষ্ণা গুহ রায় (কলকাতা, ভারত)	33
হিরণ্ময়ী কৃষ্ণকলি	ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত (কলকাতা, ভারত)	35
নারী স্বাধীনতার দাঁড়িপাল্লা	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	38
দ্বিধারা	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	42
কবিতা		
অতীত ও বর্তমান	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	19
কবিতার আসাযাওয়া, আমরা দুজন	সুজয় দত্ত (ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও)	20, 28
ঘরে ফেরা	কমলপ্রিয়া রায় (অগাস্টা, জর্জিয়া)	20
সত্যে সমার্থক, তুমি ও ঈশ্বর	সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	21
শুভ নারী-দিবস, ভূতের গল্প	পার্থ সরকার (হিউস্টন, টেক্সাস)	21, 29
দুরাশা না দুর্দশা, অধীনতা-একুশ-স্বাধীনতা	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	22, 27
রাইকিশোরী আজও মরে যন্ত্রণায়	কৃষ্ণা গুহ রায় (কলকাতা, ভারত)	23
মনসংগীত ১, ২, ৩	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	23, 24, 26
দুঃখ, তন্দ্রা মাঝে	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	24, 29
কিছু দরজা	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	25
হিমালয়পুত্র পেম্বা	ডলি ব্যানার্জী (দার্জিলিং, ভারত)	26
কবিতা	নমিতা রায়চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	30

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা

বৈশাখ ১৪২৬, এপ্রিল ২০১৯

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ ও শেষ পাতা

বৃন্দা বিশ্বাস

সহযোগিতায়

রূপছন্দা ঘোষ

চন্দ্রা দে

নমিতা রায়চৌধুরী

ভজেন্দ্র বর্মন

অসিত কুমার সেন

মুদ্রণ সহযোগিতায়

শুভেন্দু চক্রবর্তী

মৃণাল চৌধুরী

সম্পাদনায়

মালবিকা চ্যাটার্জী

সুজয় দত্ত

২০১৮-র অক্টোবর মাসে রবি ও চন্দ্রার বাড়িতে আমাদের যে সাহিত্য সভাটি হয়, তার একটি বৈশিষ্ট্য আছে।
আমাদের সভার সভ্য শ্রীমতী শাহেদা ও শ্রী শেলী শাহাবুদ্দিন প্রথমবার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছিলেন এই সভায় যোগদান করতে। যদিও তাঁরা বহুদিন যাবৎ পাঠচক্রের সভ্য, কিন্তু কখনও উপস্থিত থাকতে পারেননি সভায়।
এই সভায় তিনজনকে মানপত্র দেওয়া হয় –
শ্রী অসিত কুমার সেন (সাহিত্য সভা, পত্রিকা ও পাঠচক্রের প্রবর্তক),
শ্রী শেলী শাহাবুদ্দিন (প্রায় গোড়ার দিকে কলেজ স্টেশনে থাকাকালীন সময় থেকে পাঠচক্রের সভ্য ও আমাদের পত্রিকার একজন মাননীয় লেখক)
এবং শ্রীমতী মালবিকা চ্যাটার্জী (বর্তমান সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদিকা)।

সম্পাদকীয়

আমারা সকলেই অনুভব করি আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎটা কেমন চটপট বদলে যাচ্ছে। পরিবর্তন এক অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার, যা থামানো যায় না। নতুন চিন্তাধারা, নতুন ধারণা সবই জীবনের অঙ্গ। নতুনকে যেমন আমরা অস্বীকার করতে চাই না তেমন চিরাচরিত কিছু ছোঁয়া নতুনের মধ্যে থাকলে অসুবিধে কোথায়?

উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে বাংলা বানান। আধুনিক যুগে যেভাবে বাংলা লেখা হয় বা বানান করা হয় তেমনভাবে যদি ছোটবেলায় আমরা পরীক্ষার খাতায় লিখতাম তাহলে নির্ঘাত পাতাজুড়ে একটা বড়সড় গোল্লা জুটত। সামান্য একটু আধটু ভুলের জন্য কত না নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে সে সময়। মনে হত এই বানান-ব্যাকরণের বিধি-বিধানটা কেন একটু সরলীকরণ হতে পারে না? কী এসে যায় তাতে? কিন্তু পরিণত বয়সে পৌঁছানোর পর থেকে মনে হয় সবকিছুর একটা বাঁধন, আভিজাত্য, একটা পদ্ধতি, একটা নিয়ম থাকা দরকার যা সকলে মেনে চললে বোধশক্তির সুবিধা হয়।

বাংলা ভাষার ইতিহাস হাজার বছরেরও পুরনো। কিন্তু ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চর্যাপদের মাধ্যমে আমরা মোটামুটি তার নিদর্শন পাই। সে ছিল প্রাচীন বাংলা। তারপর এল মধ্য বাংলা, তারও পরে আধুনিক বাংলা (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে), যে বাংলা আমরা এখন ব্যবহার করি। পুরনোকালে বাংলা ভাষার ঢং ছিল আলাদা। আস্তে আস্তে সাধুভাষা ও কথ্যভাষার প্রচলন হয়। সাহিত্য তখন সাধুভাষাতেই রচনা করা হত। আধুনিক ভাষা প্রবর্তনের ফলে এখন কথ্যভাষা সাহিত্যে একটা বিরাট স্থান করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলের সময় থেকে আমরা বাংলা সাহিত্যে বর্তমান ঢং লক্ষ্য করি। কিন্তু অবশ্যই তখনও বানানে অনেক নিয়ম ছিল, এখন কোনও নিয়মের বালাই পাট নেই বললেই চলে।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলায় আমরা ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চারণের পার্থক্য দেখতে পাই ঠিকই, কিন্তু এই দুই জায়গাতেই যখন বাংলা সাহিত্য রচনা হয় তখন সেখানে কোনও স্থানগত বা উচ্চারণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

হিউস্টনে আমাদের এই পাঠচক্র সাহিত্য সংগঠনে আমরা চেষ্টা করি সকল লেখক লেখিকাকে উৎসাহ দেবার। এখানে সাহিত্য সৃষ্টি কারোরই পেশা নয়। সকলেই লেখেন তাঁদের সাহিত্যের প্রতি নিছক ভালবাসার খাতিরে এবং তাঁদের পেশাগত কাজের অবসরে।

এই সংখ্যায় লেখার পরে রেখাচিত্রগুলি সবই নমিতা রায়চৌধুরীর সৃষ্টি। নমিতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

১৪২৬ সাল এসে গেছে। গুরুদেবের ভাষায় "মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জ্বরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।"

সকলকে নতুন বছরের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে -

মালবিকা চ্যাটার্জী

বাংলা সাহিত্য ও হিউস্টনের সাহিত্য সভা - পঞ্চাশ বছর পর

মৃণাল চৌধুরী

এই লেখার বিষয় হচ্ছে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর বাংলা সাহিত্য আর আমাদের হিউস্টনের সাহিত্য সভা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে|

স্বভাবতই মনে হতে পারে, পৃথিবী যেভাবে এগোচ্ছে, আর আমাদের দেশ, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের যা হাল, পঞ্চাশ বছর পর বাংলা সাহিত্যের কোন অস্তিত্বই থাকবে না | অথবা অস্তিত্ব থাকলেও ইংরিজি হিন্দি মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ি মার্কা ভাষায় পরিণত হবে | রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, সুনীল গাঙ্গুলী শুধু ইতিহাসই নয়, প্রাগৈতিহাসে পরিণত হবে | ভাষার ক্রমোন্নতি দূরে থাক, অস্তিত্ব নিয়েই অনেকের মনে সংশয় আছে|

তাহলে রবি ও চন্দ্রার এই সাহিত্য সভা সামলানোর কী হাল হবে তা কল্পনার অতীত | কে ধরে রাখবে এই সংস্থাকে? তবে কি একেবারে বিলীন হয়ে যাবে এই সভা? কেউ কি মাসের শেষ রবিবার সাড়ে তিনটেয় মিলিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের কিছু চর্চা করবে না? দেশ থেকে অনেক দূরে বাংলা কবিতা বা গল্প পড়ে বা শুনে আর তার সঙ্গে বেশ কিছু ভুরিভোজ করে পরম তৃপ্তি নিয়ে যে বাড়ি ফিরতাম, তার কি কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না!

আমি মনে করি, বাংলা ভাষার একটা জোয়ার আসবে| অন্ধকারের পর যেমন আলো আসে, ভাঁটার পর যেমন জোয়ার - তেমনি; অন্ধকারের জন্যই যেমন আলোর বিকাশ! আমার যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেচনা বলে বাংলা ভাষার জোয়ার আসবে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে| পৃথিবীর এক অন্যতম ভাষা বলে প্রতিষ্ঠিত হবে এই বাংলাভাষা; আর রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত হবেন আসল অর্থে "বিশ্বকবি" হিসাবে | যাঁরা ওঁকে "বিশ্বকবি" আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁদের দূরদর্শিতার জন্য আমি তাঁদের সেলাম জানাই | আমার মনে হয় আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কিংবা তার অনেক আগেই হলিউড থেকে "Tagore" নামক মুভি মুক্তি লাভ করবে | যেমন করে ১৯৭৫ সালে এক ইংরেজ ডিরেক্টর রিচার্ড অ্যাটেনবোরোর (Richard Attenborough) মাথায় এসেছিল গান্ধী এমনই এক চরিত্র যার ওপর মুভি করলে তিনি নিজে প্রসিদ্ধ হবেন, বিশ্বের অন্যতম মুভি ডিরেক্টর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবেন এবং হলিউড মুভির ইতিহাসে একটা ল্যান্ডমার্ক তৈরী করবেন| ওঁর হিসেব ঠিক ছিল| "Gandhi" মুভির সাফল্য ইতিহাস তৈরী করেছিল | গান্ধী চরিত্রে বেন কিঙ্গসলির অভিনয় ছিল অসাধারণ! আর গান্ধী "মহাত্মা" হিসাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন|

আমার ধারণা আগামী দশ-কুড়ি বছরের মধ্যে হলিউড মুভি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত কোনও একজন ডিরেক্টরের মাথায় আসবে রবীন্দ্রনাথও এমন একটি চরিত্র যাঁর ওপর "Tagore" নামে একটা মুভি করলে তিনি নিজে একজন অন্যতম ডিরেক্টর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবেন, অনেক টাকা রোজগার করতে পারবেন, এমনকি অস্কারও পেতে পারেন | আর তার ফল হিসাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃত অর্থে "বিশ্বকবি" হিসাবে জগতে স্বীকৃতি পাবেন | আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আগামী কিছু বছরের মধ্যেই এই ঘটনাটি ঘটবে|

এই প্রসঙ্গে বলি, এক বাঙালি ডিরেক্টর, যিনি হলিউডের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁর সঙ্গে আমি ফোনে কথা বলেছিলাম, প্রথমে বোধ হয় আমার কথাটা উপলব্ধি করতে পারেননি তিনি| ঋতুপর্ণ ঘোষের রবীন্দ্রনাথের ওপর ডকুমেন্টারির কথা, পরে হলিউড থেকে "Gandhi" মুভি প্রকাশ পাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করায় গুরুত্বটা বুঝতে পারেন এবং বলেন, আপনার কথায় যুক্তি আছে, কথাটা বরাবর মাথায় থাকবে|

এবার বাংলা ভাষার প্রসঙ্গে আসি| অবশ্যই এখন ভাঁটা চলছে | তবে জোয়ার আসার ইঙ্গিত আছে | আমাদের সাহিত্য সভার কথাই ধরুন না - আমরা এখন ইন্টারনেট এবং google-এর দৌলতে অল্পদিনের মধ্যেই ই-মেলের বিষয়গুলো বাংলায় আদান প্রদান করছি | সম্পূর্ণ বাংলায় একটা ওয়েবসাইট তৈরী হয়েছে | আমার ধারণা আগামী পঞ্চাশ বছরের অনেক আগেই ইংরিজি ভিত্তিক একটা আন্তর্জাতিক ভাষা তৈরী হবে নানা ভাষার আদান প্রদানের মাধ্যমে | সেই আন্তর্জাতিক ভাষার আদান প্রদানের পরিধি ক্রমেই বাড়তে থাকবে | তাতে করে বাংলাভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার মধ্যে একটি বিশেষ ভূমিকা নেবে, বিশেষ করে বাংলাদশের পরিপ্রেক্ষিতে|

ভারতবর্ষে বাংলাভাষা একটি আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে যে অন্তরায়টা আছে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা নেই | তাছাড়া

বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে ভাষা ভিত্তিক কারণে | বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েই বাংলাদেশের সৃষ্টি | তাই বাংলা ভাষার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের অপরিসীম ভালবাসা |

নানা টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের একটি স্থিতিশীল দল তৃতীয়বার সরকার গঠন করেছে | ভোটের মাধ্যমে পর পর তিনটি স্থিতিকাল অতিক্রম করতে পারলে দেশটা গণতান্ত্রিকভাবে স্থায়ী হয় এবং অগ্রগতির পথ ধরে এগিয়ে যায় | তাই নানা সমীক্ষায় এবং আন্তর্জাতিক তথ্যে বাংলাদেশের উন্নতির কথা উল্লেখ হচ্ছে | দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষার মর্যাদা বাড়বে, বাড়বে পরিধি | বিশ্বদরবারে বাড়বে বাংলাভাষার পরিচিতি | আজ যদি গুগল সার্চে পৃথিবীর প্রথম সারির দশজন লেখক বা কবির নাম জানতে চান, দেখবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সেখানে নেই | যাঁরা আছেন তাঁরা হলেন William Shakespeare, James Joyce, Oscar Wilde, Fyodor Dostoevsky, Ernest Hemingway, Virginia Wolfe, Charles Dickens, Edgar Allan Poe, William Faulkner, Franz Kalka |

বাংলা ভাষার পরিচিতি বাড়াবার প্রয়াসে মূলতঃ সুমিতা বসু, শিকাগোর খায়রুল আনাম মোল্লা, বস্টনের গৌরী দত্ত ও সুমিত নাগ, ফিলাডেলফিয়ার রঞ্জন মুখার্জী, আমি - মৃণাল চৌধুরী ও প্রয়াতঃ হৈমন্তী দোড়াই মিলে প্রতিষ্ঠা করেছি BLGG (Bengali Literature Goes Global) বলে একটি উদ্যোগ | আমাদের প্রথম প্রয়াস বা পাবলিকেশন "Treasures from Bengal - An Anthology of Selected Bengali Short Stories", যা ২৪টি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ছোট গল্পের ইংরিজি অনুবাদ | সুমিতা বসুর কলকাতার পাবলিকেশন কম্পানি Indic House এই বইটির প্রকাশক | অদূর ভবিষ্যতে এই বইটির এক আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হিউস্টন ও আমেরিকার অন্যান্য শহরে করার প্রয়াস আছে | এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য |

এখন কথা হচ্ছে, আগামী পঞ্চাশ বছরে আমাদের সংস্থা আমাদের সাহিত্য সভার পরিণতি কী হবে! আমার গণনায় সাহিত্য সভার অস্তিত্ব থাকবে | ইভোল্যুশন ও বিবর্তনের খাতিরে ধারা যাবে পাল্টে | কেননা তখন হাল ধরবে রবি ও চন্দ্রার বদলে আগামী প্রজান্মের জুটি বব ও ববিতা যারা বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে চিনবে |

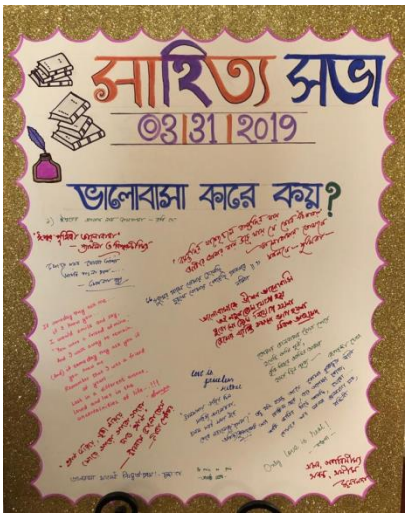

৩/৩১/১৯ সভায় একটি আলেখ্য উপহার দিলেন সভ্যরা ↓

নারীদিবস উদযাপনে নারীরা ↓

একটি আশ্চর্য মামলা

শেলী শাহাবুদ্দিন

ভারতে রাফায়েল স্যামুয়েল নামে ২৭ বছরের এক ব্যক্তি তার বাবা-মা'র বিরুদ্ধে মামলা করেছে বা করার পরিকল্পনা করছে। অভিযোগ: কেন তাঁরা তার অনুমতি ছাড়া তাকে পৃথিবীতে আনল (১)। রাফায়েল অবশ্য স্বীকার করেন যে অনুমতির ব্যাপারটা অবাস্তব। কিন্তু তার মূল যুক্তি হ'ল, পৃথিবীতে মানুষের যে দুঃখ-কষ্ট, তা আগে থেকে জানা থাকলে সে নিজে জন্ম নিতে চাইত না। অর্থাৎ তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার বাবা-মা তার জন্ম দিয়েছে। এখন তার সমস্ত জীবনের খরচ তার বাবা-মায়েরই বহন করা উচিত। জীবন ধারণের খরচটাও আসল কথা নয়। স্যামুয়েল এক সফল স্বনির্ভর ব্যবসায়ী। এর মূলে নাকি আছে Anti-Natalism বা জন্মবিরোধী এক দার্শনিক তত্ত্ব। জন্মবিরোধীদের মতে মানুষের জীবন যেহেতু দুঃখ-কষ্টে ভরা, তাই মানুষের উচিত বংশবৃদ্ধি একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া। এতে মানুষের দুঃখ-কষ্টের যেমন অবসান হবে, তেমনিই মনুষ্যবিহীন পৃথিবী এবং এই পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীরা অনেক ভাল থাকবে।

আমি এই দর্শন উড়িয়ে দিতে পারি না, যদিও আমি মনে করি দুঃখ-কষ্ট প্রয়োজনীয় এবং তাই নিয়েই মানুষের জীবন মহৎ। এ জীবন না থাকলে আমরা যেমন রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপিয়ার পড়তে পেতুম না, তেমনি আমরা আসলে জানি না মানুষ না থাকলে পৃথিবীর কী অবস্থা হত। রবীন্দ্রনাথের harmony তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বজগতে যা কিছু আছে তার সবই প্রয়োজনীয় (২)।

কিন্তু রাফায়েলের অভিযোগের অন্য একটি দিক আমাকে উদ্বিগ্ন করে। বাংলাদেশের 'থিয়েটার' গ্রুপের 'সুবচন নির্বাসনে' নামক এক নাটকে বিষয়টি অন্যভাবে দেখানো হয়েছে। সেই গল্পে মৃত্যুর পর তিন ভাই-বোন ভগবানের কাছে তাদের বাবা-মা'র বিরুদ্ধে নালিশ করেছে তাদের জীবন যন্ত্রণার জন্য। মেয়েকে বাবা-মা শিখিয়েছেন 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। সেই শিক্ষা অনুযায়ী চলতে গিয়ে মেয়েটিকে আগুনে পুড়ে মরতে হয়। বড় ছেলেকে শিখিয়েছিলেন 'সদা সত্য কথা বলিবে'। ফলে তাকে আততায়ীর হাতে নিহত হতে হয়। ছোট ছেলেকে শিখিয়েছেন 'গুরুজনকে ভক্তি করিও'। তার ফলে ছোট ছেলেকে সারাজীবন বিনা দোষে জেল খাটতে হয়।

এই গল্পে মূল বিষয় 'ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধ ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজে তার দ্বন্দ্ব'। কিন্তু শিশুদের সাথে সমাজ ও বাবা-মায়ের সম্পর্কের বিষয়টি আমাকে বেশি উদ্বিগ্ন করে। এই মামলা আমাদের ভাবতে বাধ্য করে সংকটের আরো গভীরে। যে সংকট আমি দেখি প্রকটভাবে পাশ্চাত্যে। এখানে প্রাচুর্যের সাহায্যে বাবা-মা সন্তানকে ফর্মাল বা আনুষ্ঠানিক সব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকেন। আইন অনুযায়ী সন্তান লালন-পালনে দেখা যাবে বাবা-মা'র কোন বিচ্যুতি নেই। কিন্তু প্রাচ্যে পারিবারিক স্নেহের যে সর্বময় পরিবেশ বংশ পরম্পরায় গড়ে উঠে শিশুর চারপাশে স্বাভাবিক জীবন-যাপনের এক অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছিল, এবং যা হয়তো এখন ভাঙতে শুরু করেছে, পাশ্চাত্যে তা ধ্বংস হয়ে গেছে পরিপূর্ণভাবে।

আমেরিকায় শিশুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলেই আমার মনে হয়। প্রবল আইনের শাসনের কারণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিশু অধিকার এবং তার যত্নের ত্রুটি সমাজের বিরুদ্ধে আদালতে প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শিশুদের প্রতি এদেশের মানুষের যে মনোভাব তার মধ্যে আমি আমার ধারণার স্বপক্ষে কতগুলি প্রমাণ পাই। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

১ - খুব সহজ উদাহরণ, আমাদের চারপাশে শিশুদের কলকাকলি আমরা উপভোগ করি। কিন্তু আমেরিকায় মানুষ সাধারণত তাতে বিরক্ত হয়, বিশেষকরে জনসমক্ষে। ডাক্তারের অফিসে বা যে কোন অপেক্ষার জায়গায় দেখা যায় ছোটদের অকারণেই বড়রা ধমক দিচ্ছেন, যেন তারা একেবারে চুপচাপ থাকে।

২ - হুমায়ুন আহমেদ লিখেছেন, আমেরিকার মানুষকে যখন কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা যেমনি থাকুক, উচ্ছ্বসিতভাবে জানাবে যে তারা খুব ভাল আছে। আমি মানি যে এ এক ভাল অভ্যাস। কুশল বার্তা আদান প্রদানে নিজের দুঃখের খবর সবাইকে না জানানোই ভাল।

একইভাবে এদেশে এমনিতে একজন মহিলাকে তার নবজাতক সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে শোনা যাবে নবজাতকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। কিন্তু আপনি যদি ঘনিষ্ঠ বা সুপরিচিত মহিলাকে প্রশ্ন করেন, তখন অনেকের কাছেই শুনবেন তাঁরা বিয়ে করলেও সন্তান নিতে রাজি নয়। বাচ্চারা শুধু সমস্যা সৃষ্টি করে। এসব বলার সময় শিশু সম্বন্ধে যে মনোভাব প্রকাশ পায়, তার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে

এদেশে প্রাচ্যের মতো শিশুরা আনন্দের বিষয় নয়, মস্ত বড় সমস্যার বিষয় | তারা শুধু খায়, কাঁদে আর নোংরা করে | আমাদের প্রাচ্য সমাজে তারা যে অবিচ্ছিন্ন প্রশংসা, আশা, আনন্দ আর সুখের বিষয়, সেটি এদেশের মানুষকে বোঝানো অসম্ভব|

৩ - চাকরি করতে গিয়ে দেখেছি এদেশে যখন কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা দুর্ব্যবহার করে বা অতিরিক্ত সমস্যা সৃষ্টি করে, তখন অধিকাংশ সময় বলা হয় তারা শিশুর মতো আচরণ করছে (behaving like a baby)| ওপরওয়ালা যখন দোষী কর্মচারীকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে কিছু বলে, কর্মচারী প্রথমেই প্রতিবাদ করে বলবে, "I am not a baby, বা I am not a child, আমি শিশু নই, আমাকে তুমি এসব বলতে পারো না|"

সব মিলিয়ে যা দাঁড়ায়, তা হ'ল, শিশুদের আচরণ মাত্রই খারাপ| এত খারাপ যে, যে সকল কর্মচারী সবচেয়ে খারাপ, শিশুরা তাদের মতো|

আমার উদ্বেগ আরো বাড়ে যখন দেখি ADHD এবং Autism স্পেকট্রাম নামে এক ধরনের বিতর্কিত রোগ নির্ণয় করে শিশু নিপীড়নের ব্যবস্থা | যে কোন শিশু একটু ভিন্ন ধরনের হলেই তাকে এ দুটি রোগের কোন একটির অন্তর্ভুক্ত করা হবে| তারপর ওষুধ খাওয়ানো হবে| এতে বাবা-মা খুশি, কারণ তাঁদের সময় বাঁচে এবং ছেলেমেয়েদের আচরণ, যার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের অবহেলা ও সময়ের অভাব (সন্তানকে যথাযথ সঙ্গ না দিতে পারা) দায়ী, তা থেকে তাঁরা নিজেদের দায়িত্বমুক্ত মনে করার সনদ লাভ করেন| 'ওটা তো রোগ| কাজেই বাবা-মা দায়ী হতে পারে না'|

এসব ঔষধ মানুষের স্নায়বিক ব্যবস্থাকে উত্তেজিত বা অবসন্ন করে | দীর্ঘ ব্যবহারে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত হতে হতে অস্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে| একান্ত বাধ্য হলে ঔষধ খাওয়াতে হয় | কিন্তু সামান্য কারণে ঔষধ খাওয়ার চাইতে না খাওয়াই ভাল | মনে রাখা প্রয়োজন যে মানুষ প্রকৃতির সন্তান | যা কিছু প্রাকৃতিক, মানুষের জন্য তাই শ্রেয় | আর যা কিছু অপ্রাকৃতিক বা artificial, মানুষের জন্য তা ঝুঁকি (Risky) বিশেষ | যে কারণে জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানে এখন অতি-চিকিৎসা বা over-medicalization-এর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী এক আন্দোলন চলছে (৩)| কিন্তু ক্লিনিশিয়ান বা হাসপাতাল-কেন্দ্রিক চিকিৎসকরা চলে বিপরীতমুখী কর্পোরেট জগতের মুনাফাধর্মী আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে| মুহূর্তের মধ্যে অসহায় ছোট্ট শিশুদের সামান্য কারণে এইসব বিতর্কিত রোগের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে মনোবৈকল্য সৃষ্টির ঔষধ লিখে দিতে এদের হাত একটুও কাঁপে না | ওই শিশু আর তার অসহায় বাবা-মা'র জীবনের কথা তারা ভাবে না|

আমি স্বাভাবিক ও প্রতিভাবান কিছু শিশুকে ADHD বা অটিজম স্পেকট্রাম উপাধি পেয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখেছি| অথচ কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে ADHD নামে কিছু থাকারই কথা নয় (৪,৫)| অটিজম যদিও এক ধরনের রোগ, কিন্তু স্পেকট্রাম নাম দিয়ে এই রোগের বা অবস্থার সীমারেখা এত বিস্তৃত করা হয়েছে যে মহাব্যস্ত চিকিৎসকরা স্পেকট্রামের যে কোন একটি ছোট লক্ষণ দেখেও একটি শিশুকে রোগী ঘোষণা দিয়ে দিতে পারে| অথচ সে শিশুটি মোটেই রুগী নয়; সে হয়তো অন্যরকম|

মানুষ যে জীবজগতে শ্রেষ্ঠ তার অন্যতম এক কারণ ও নিয়ামক এই যে তারা পরম বৈচিত্রময় | তারা পশুপালের মতো সবাই একরকম নয়| মানুষকে পশুপালের মতো সব এক করে ফেলার ভয়াবহ সম্ভাবনা নিয়ে অলডাস হাক্সলি (Aldous Huxley) ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তাঁর "ব্রেইভ নিউ ওয়ার্ল্ড" বইতে|

আমার মনে হয় পাশ্চাত্য সমাজ খুব ধীরে ধীরে অলডাস হাক্সলীর ব্রেইভ নিউ ওয়ার্ল্ড-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে|

এছাড়া রোগ নির্ণয়ের মৌলিক পদ্ধতিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে সেও এক চিন্তার বিষয় | প্রাচ্যে রুগীর সংখ্যা বেশি, কিন্তু রোগ নির্ণয়ের প্রযুক্তি (Lab & imaging) ব্যায়বহুল হওয়াতে তার সুযোগ সংকীর্ণ| সেখানে চিকিৎসকরা রোগের লক্ষণ ও শারীরিক পরীক্ষার ওপর বেশি নির্ভর করেন| ফলে জটিল রোগ নির্ণয়ে ভুল বা দেরি হওয়া স্বাভাবিক|

পাশ্চাত্য এদিক থেকে এগিয়ে| কিন্তু প্রযুক্তি নির্ভর হতে গিয়ে এবং রুগী স্বল্পতার কারণে, পাশ্চাত্যে চিকিৎসকদের নিজেদের রোগ নির্ণয় দক্ষতা (clinical skill) ক্রমাগত হ্রাস পেতে পেতে বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে | প্রাচ্যে একজন চিকিৎসক কখনই দু-একটি লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় করেন না | সবগুলি লক্ষণ এবং শারীরিক পরীক্ষার ফলাফল যোগ করে রোগ নির্ণয় করেন | কিন্তু পাশ্চাত্যে দু-একটি লক্ষণ দেখে অটিজম

স্পেকট্রাম রোগ নির্ণয় হতে আমি দেখেছি | রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসায় অতি-চিকিৎসা প্রবল হয়ে উঠেছে | জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অতি-চিকিৎসার মুনাফা যায় ব্যবসায়ীদের ঘরে| আর আমার সন্দেহ, এসব রোগ আবিষ্কৃত হয় ঔষধ কোম্পানির গবেষণাগারে|

প্রাসঙ্গিক আর একটি গুরুতর বিষয় -

পরিসংখ্যান দেখলে জানা যায় যে আমেরিকায় উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরাই সবচাইতে বেশি মাদকাসক্ত (৬, ৭, ৮)| ব্যক্তিগতভাবেও দেখেছি আমার উচ্চশিক্ষিত সহকর্মীর একমাত্র ছেলে মাদকাসক্তির জন্য জেল খাটে | প্রাচুর্যময় এই সমাজে বিষয়টি সমাজ জীবনে বড়জোর পুকুরে একটি ঢিল ছোঁড়ার মতো সামান্য ঢেউ তুলে মিলিয়ে যায় | কিন্তু হাজার হাজার ঢিল মিলে একদিন এই পুকুর যে মজা পুকুরে পরিণত হবে না তা আমি নিশ্চিত নই | এই মাদকাসক্তি আর তারও পেছনে আমেরিকার সমাজ জীবনে পারিবারিক সম্পর্কে আমি এই সভ্যতার পতনের পূর্বাভাস দেখি | কেন এরকম হচ্ছে? যে দেশ প্রাচুর্য আর প্রযুক্তির শীর্ষে তারা কেন সন্তান পালনে এমন হতশ্রী? তাদের সন্তানরা কেন এমন মাদকাসক্ত?

এই সমস্যার পেছনে নিশ্চয় বহু কারণ আছে | তার মধ্যে সম্পর্ক এবং সে বিষয়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি আমার কাছে গভীরতম কারণ বলে মনে হয় | অর্থাৎ আমার মনে হয় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবজাতি একসময় যে পারিবারিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল, বিশেষ করে যৌথ পরিবারে, সেখানে বারোয়ারী হারে বেড়ে ওঠা কোন কোন সন্তান যদিও অবহেলিত হত, তেমনি মানবসন্তান জন্মের পর তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাধাহীনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেত | ফলে মানবজাতি পেয়ে এসেছে আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়র, বিটোফেন, নজরুল | কিন্তু এখন পাশ্চাত্য সমাজ আমাদের নিয়ে চলেছে ব্রেইভ নিউ ওয়ার্ল্ডের অ্যাসেম্বলি লাইনের দিকে | সেখান থেকে তৈরী হবে তালিকা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নিখুঁত ও বিশেষ কার্যক্ষম (specialized) শিশু | মান নিয়ন্ত্রণ হবে কঠোর ও বিস্ময়কর! অ্যাসেম্বলি লাইনে কারো মধ্যে বিচিত্র শিশু হওয়ার লক্ষণ দেখামাত্র তাকে জীবন থেকে বর্জন করা হবে|

অবধারিতভাবে পাশ্চাত্যের উন্নতির ঢেউ যথাসময়ে পৌঁছে যাবে প্রাচ্যে | ক্রমবর্ধমান ভঙ্গুর পারিবারিক কাঠামো তার প্রথম লক্ষণ | স্যামুয়েল হয়তো আমার মতো সন্দেহবাদী, অথবা সমাজ ও পরিবারের ভেতরের কিছু পরিবর্তন তাকে অস্থির করে তুলেছে| সে হয়তো নিজে পুরো বিষয়টি বুঝতেও পারছে না | কিন্তু আদালতে তার মামলা জীবনের এইসব অন্তর্নিহিত সংকটের প্রতিফলন মাত্র | নইলে কেন স্যামুয়েলের মনে হ'ল এ পৃথিবীতে বাবা-মা তাকে না আনলেই ভাল হত?

আর সমস্ত কিছুর পেছনে আমার মনে হয় বিবর্তনের কিছু অপ্রতিহত নিয়ম নীরবে কাজ করে চলেছে | অলডাস হাক্সলীর নতুন পৃথিবী আমাদের জন্য সতর্কবার্তা মাত্র | সেই পৃথিবীর জন্য মানবজাতির সৃষ্টি হয়নি | বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে পারিবারিক কাঠামো গড়ে উঠেছে, সেটি দীর্ঘকাল মানবজাতির প্রাথমিক প্রয়োজন মিটিয়ে তার বর্তমান অবস্থায় এনেছে | এ অবস্থায় আমরা আণবিক বোমার অধিকারী | তার অর্থ এই নয় যে বোমা মেরে আমরা নিজেদের ধ্বংস করে দিতে চাইব | তেমনি প্রাচুর্য আর আধুনিক জীবন আমাদের অতি ব্যস্ত করে তুলেছে | তার অর্থ এই নয় যে আমরা শিশুদের দেয় সময়টুকু কেড়ে নিয়ে স্বার্থপরের মতো নিজের পেশা আর সম্মান বাড়াবার জন্য ক্রমাগত ব্যস্ত থাকব|

দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে সভ্যতা যখন প্রযুক্তি আবিষ্কার শুরু করে তখন অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে, এবং মানুষের জন্য উদ্বৃত্ত সময় তৈরী হয় (৯)| এই উদ্বৃত্ত সময় দিয়ে মানুষ শিল্প, সংস্কৃতি ও অন্যান্য মানবিক কাজে আনন্দলাভ করতে পারবে, যার মধ্যে শিশুসঙ্গ হবে অন্যতম | কিন্তু মানুষ বেছে নিয়েছে অকারণ ইঁদুর দৌড় (Rat race)| তাহলে কি মনে করা যায় যে বিবর্তন মানুষকে যেদিকে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করছে, মানুষ সেদিকে না গিয়ে উল্টোদিকে হাঁটছে? ফলে প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে প্রতিকারের ব্যবস্থা করছে? এর শুরু হয়তো মানুষের সমাজ ও মনে এই শিশুবিরোধী মনোভাব দিয়ে| সমাপ্তি হয়তো হবে মানবজাতির অবসান দিয়ে | Ante-natalist-দের জন্মবিরোধী তত্ত্ব তখন প্রতিষ্ঠিত হবে বিবর্তনের মধ্য দিয়েই|

****

(১). BBC News. https://www.bbc.com/bengali/news-47156771)

(২). The Religion of Man. Rabindronatha Tagore. Martino Publishing. PO Box 373. Mansfield Center, CT 06250 USA (2013). The Macmillan Company 1931.

(৩). Medicalization: A growing Menace. Arunima, Sarvdeep Kohli. Department of Psychology, MD. University, Rohtak. Delhi Psychiatry Journal Vol.15 No.2. October 2012.

(৪). No, There Is no Such Thing as ADHD. Different temperaments make some kids more active. Robert Berezin M.D.
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-theater-the-brain/201503/no-there-is-no-such-thing-adhd

(৫). Is ADHD Real? So why does everyone think it is? Marilyn Wedge Ph.D.
https://www.psychologytoday.com/us/blog/suffer-the-children/201803/is-adhd-real

(৬). Drug Facts: National Trends. National Institute on Drug Abuse- NIDA.
https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/nationwide-trends

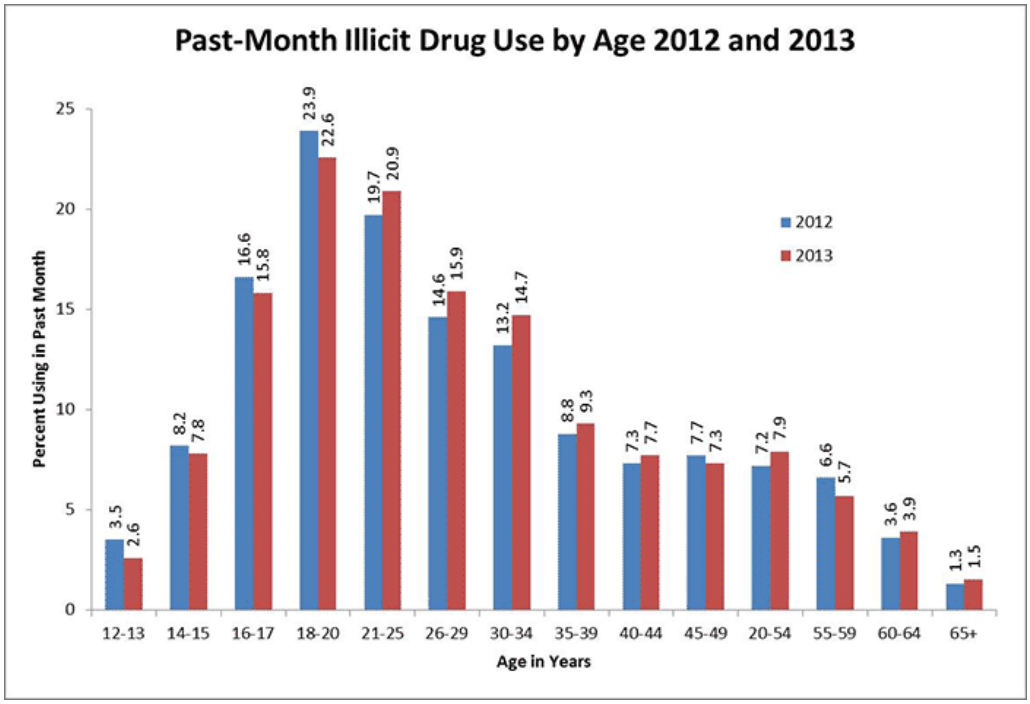

গ্রাফ: Drug Facts: National Trends. National Institute on Drug Abuse- NIDA

(৭). Teen Drug Addiction & Alcoholism Statistics in the United States
https://www.projectknow.com/teen/abuse-statistics/

(৮). Teen Substance Abuse Statistics Coming into 2018 - Ashwood Recovery
https://www.ashwoodrecovery.com/blog/teen-substance-abuse-statistics-coming-2018/

(৯). In Praise of Idleness. Bertrand Russell. Harpers Magazine, October 1932. https://harpers.org/archive/1932/10/in-praise-of-idleness/

খাদ্য ও খাবার নিয়ম

ভজেন্দ্র বর্মন

নিমন্ত্রণ খেতে গেলে অনেকের সাথে দেখা হয় এবং বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা বিনিময় হয় | সেইসাথে কে কী খেতে ভালবাসেন তা বোঝা যায় ও কীভাবে তাঁরা খান তাও চোখে পড়ে | রেস্ট্যুরেন্টে গেলেও এসব দেখা যায় | অফিসের খাবার ঘরে যখন অনেকের সাথে আহার করি, তখন অনেকেই বাড়ি থেকে আনা খাবার খান | অন্যান্যরা আবার ক্যাফেটেরিয়ার বিভিন্ন রকমের খাবার থেকে নিজের পছন্দ বা সাধ্যমত খাবার কিনে খেতে পছন্দ করেন |

অনেক খাবার দেখতে সুন্দর | মশলা দিয়ে রান্নাকরা খাবারের সুগন্ধ সবাই পছন্দ করেন; যদিও এদেশে এসব খাবার অনেকে খেতে চান না | এসব নাকি পেট গরম করে | কিছু কিছু খাবার আছে তার গন্ধ ভাল নয়; আবার কিছু আছে যা দেখতে তেমন ভাল নয়, সেগুলো অনেকেই এড়িয়ে চলতে চান | এ খাবারগুলোও অন্যের কাছে প্রিয় | প্রিয় না হলে তাঁরা খাবেন কেন? এটাও চোখে পড়ে যে খাবার কেউ কম খান, কেউ একটু বেশী খান | আবার কারো খাবারই জোটে না! বিচিত্র হওয়ার কারণে খাদ্য ও খাওয়ার বর্ণনা দেওয়া সহজ নয় |

খাদ্যের উপাদান

বিজ্ঞানের মতে খাদ্যের ছয়টি উপাদান হল শর্করা, প্রোটিন বা আমিষ, স্নেহপদার্থ বা ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল | বাঁচার জন্য জলের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী | দেহে জলের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ | বিশেষজ্ঞদের মতে দিনে আট আউন্স করে জল অন্তত আটবার খাওয়া উচিত | এ নিয়মে প্রতিদিন অন্তত দু'লিটার জল খেতে হয় | পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার খেলে ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা অন্যান্য খাবারের থেকে যা পাওয়া যায় তাতেই যথেষ্ট | যখন তাদের ঘাটতি দেখা দেয় তখন এসব আলাদা করে খেতে হয় | এখন বাকী থাকে শর্করা, প্রোটিন ও ফ্যাট | সবাই এগুলো পরিমাণমতো খেলে কোন কথা বলার অবকাশ ছিল না | সবগুলো যেমন খাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, তেমনি এগুলো বেশী বা কম খেলে নানা ধরনের সমস্যাও দেখা দিতে পারে | বেশী খেলে ওজন বাড়ে, রক্ত চাপের ও হৃদরোগের সমস্যা দেখা যায় | যাঁদের এসব খাওয়ার সামর্থ নেই, তাঁরা অপুষ্টিতে ভোগেন | বর্তমানে বিশ্বে আনুমানিক ৭৬০ কোটি মানুষ বাস করেন | এঁদের মধ্যে ১১% পুরুষ এবং ১৫% মহিলা ওজনে মোটাসোটা; বিপরীতে ৯% পুরুষ এবং ১০% মহিলার ওজন স্বাভাবিক যা হওয়া দরকার তার চেয়ে কম | প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে ৮৫ কোটির বেশী ভীষণ অপুষ্টিতে ভোগেন | গরীব দেশ, দ্বন্দ্বপূর্ণ বা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অঞ্চলে এসব লোক বসবাস করেন | সবচেয়ে বেশী এশিয়া মহাদেশে ৫২ কোটি লোক অপুষ্টিতে ভোগেন | আফ্রিকায় ২৪ কোটি এবং ল্যাটিন আমেরিকায় ৫ কোটি লোক অপুষ্টির শিকার | শিশু ও কিশোরদের মধ্যেও অপুষ্টি ও কঙ্কালসারের সংখ্যা কম নয় | এঁদের সংখ্যা ২৫ কোটি | পক্ষান্তরে, ওজনে বেশী যারা, তাদের সংখ্যা ৫ কোটির মতো | মোটা ও অপুষ্ট মানুষ পৃথিবীর সব দেশেই আছে | তবে বর্তমানে যা দেখা যাচ্ছে, সে হিসেবে ধনী দেশে মোটা মানুষ ও গরীব দেশে অপুষ্ট মানুষের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলবে | আমরা যা খাই, তাতে ভেজাল বা বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে | কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে - ফলমূল ও মাছে বিষাক্ত ফর্মালিন দিয়ে পচন বন্ধ করা হয় | ভেজাল তেলে রং মিশিয়ে খাঁটি সরিষার তেল হিসেবে বিক্রয় করা হয় | চাউলে পাথর মিশিয়ে ওজন বাড়ানো হয় | পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দোষমুক্ত জল পাওয়া দুষ্কর | মাছ-মাংসে ক্ষতিকারক হরমোন পাওয়া যায় | হরমোন খাওয়ানোর জন্য হাঁস, মুরগি ও অন্যান্য পশু-পাখির ওজন তাড়াতাড়ি বাড়ে | ইদানীং ঔষধেও ভেজাল পাওয়া যাচ্ছে | আমরা যেন ভেজালের যুগে বসবাস করছি | এছাড়া বায়ু দূষণের জন্য নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে কত যে দূষিত পদার্থ শরীরে প্রবেশ করছে তার হিসেব কেউ রাখি না | গরীব দেশে ভেজালের পরিমাণ ধনী দেশের তুলনায় অনেক গুণ বেশী! ভেজালকে তাই খাদ্যের সপ্তম উপাদান বললে অত্যুক্তি হবে না |

রান্না-বান্না ও খাবারের প্রস্তুতি

একই ধরনের কয়েকটি উপকরণ, লবণ এবং তৈল-মশলা পাঁচজনকে দিলে পাঁচ রকমের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের রান্না হবে; তাতে একজনের তৈরী খাবারের সাথে অন্য কারো খাবারের মিল থাকে না | তাদের রং, স্বাদ বা গন্ধ আলাদা হয় | একই কারণে দেশ ও স্থান বিশেষে খাদ্যের ভিন্নতা অবশ্যই থাকবে | এক দেশের খাবার অন্য দেশে দেখা যেতে পারে, কিন্তু সেটা ঘটে যদি সে দেশের কেউ সেরকম রান্না শিখে অন্য দেশে তা বিস্তার

করার চেষ্টা করেন | বহু জাতীয় ও সংস্কৃতির মানুষের বসবাস হেতু আমেরিকাতে বিভিন্ন দেশের খাবার সর্বত্র পাওয়া যায়|

আমাদের প্রধান খাবার ভাত কিংবা রুটির সাথে কতগুলি পদের তরকারি থাকবে তা নির্ভর করে সাধারণ নিত্য খাবার কিংবা বিশেষ আয়োজনে খাদ্য তৈরী হচ্ছে কিনা তার ওপর | অতিথি নিমন্ত্রণ করলে খাবারের পরিমাণ ও ধরন অনেক বেশী হয় | তখন টেবিলে সারি সারি খাবার দেখার মতো | রেস্ট্যুরেন্টেও একই ব্যাপার | কয়েকটি পদের খাবার বিক্রি করা থেকে ১০০-র উর্ধ্বে রান্নার পদ রাখা হয় | তা থাকাতে যাঁর যা ইচ্ছা তা খেতে পারেন | বাড়িতে হোক বা রেস্ট্যুরেন্টে হোক খাবারগুলো আগে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা যেন একটা নিয়ম | হ-য-ব-র-ল অবস্থায় না রেখে খাবারের ধরন হিসেবে এগুলো ভাগ করে রাখা হয়|

খাবার নিয়ম

বড় হোটেল বা দামী রেস্ট্যুরেন্টে একটা নিয়ম মেনে কয়েকবার খাবার দেওয়া হয় | প্রতিবার প্লেট ও কাঁটা-চামচ পরিবর্তন করা হয়| সবশেষে চা বা কফি সহযোগে খাবার বিতরণ শেষ হয় | বাড়িতে জামাই এলে এ ধরনের আপ্যায়ন চোখে পড়ে | একজন এক একটা খাবার সরবরাহ করেন, অন্য একজন পাশে থেকে বাটিতে খাবার বেড়ে এক এক পদ দিয়ে জামাইকে আপ্যায়ন করেন | এটাকে আমরা সবাই 'জামাই আদর' বলে জানি|

অতিথিদের মধ্যে দেখা যায় সবাই নিজের নিয়মে খাওয়া-দাওয়া করেন | কেউ একসঙ্গে সব কিছু নিয়ে খান | কেউ বা একটা-দুটো সামগ্রী নিয়ে খেয়ে শেষ করে আবার সাজানো খাবারের স্থানে গিয়ে তাঁর নিয়মে এরপর যা খাওয়া উচিত তা নিয়ে আসেন| অনেকে আবার সবগুলো খাবারের স্বাদ পেতে চান | একটা পদ নিয়ে এসে সব খেয়ে থালাটি মুছে নিয়ে অন্য আর এক পদ নিয়ে খান| যতক্ষণ না শেষ পদ খাওয়া শেষ হচ্ছে এটা চলতেই থাকে| এভাবে খেলে সময় নিয়ে খেতে হয়| সবশেষে আমরা মিষ্টিমুখ করি | এখানেও অনেক ধরনের মিষ্টি থাকে | বাঙালিদের প্রিয় রসগোল্লা, দই, পিঠা, রসমালাইয়ের মতো অন্তত চার-পাঁচ রকমের মিষ্টি থাকে | আমাদের যা যা খেতে ভাল লাগে তাই খাই| একটা লক্ষণীয় বিষয় যে আমাদের মধ্যে যাঁদের ডায়াবেটিজ আছে, তাঁরাও মিষ্টি এড়াতে চান না | আপনজনের চোখের আড়ালে তাঁরা মিষ্টি খান | যদি ধরা পড়েন তখন সবার সামনে বকুনিও খান|

যিনি নাকি একসঙ্গে সব নিয়ে খেতে বসেন, তাঁর বন্ধু তাঁকে একদিন বলছিলেন, 'তুমি কোনদিন মনে হয় রান্না করনি|' 'কেন' জিজ্ঞেস করায় তাঁর উত্তর, 'তাহলে এভাবে কক্ষনো খেতে না |' কথাটা বেঠিক নয় | রাঁধুনিরা এত যত্ন করে রান্না করেন, তাঁদের তৈরী জিনিসগুলো গোগ্রাসে খেলে কেমন দেখায়? এ প্রসঙ্গে আর একজন শিশু খাদকের বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে | এই বালক ছেলেকে নিয়ে মায়ের অভিযোগ যে তাকে খাওয়াতে গেলে সে এটা খেতে চায় না, ওটা খেতে চায় না| তার মা একদিন রেগে গিয়ে তাকে সব খাবার একসাথে দিয়ে বাইরে যান| কিছুক্ষণ পর এসে দেখেন, সব খাবার খাওয়া শেষ! 'কী করে খেলি?' জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, 'আগে মাছভাজা খেয়েছি, তারপর ডাল | তারপর আলুভাজি আর শাক | শেষে ভাত এমনিই খেয়েছি | ভাল করিনি?' এরপর তার মা'র আর কোন সমস্যা হয়নি কোনদিনও |

আর একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন | সেটা হ'ল বাড়িতে অতিথি এলে অনেক লোকের মধ্যে কে আগে খাবেন অথবা বাড়ির লোকজনদের মধ্যে কে প্রাধান্য পাবেন - এটা স্থান বিশেষে ভিন্ন রকম হতে পারে | সাধারণত প্রথমে ছোটদের আগে খাবার দিয়ে তাদের শান্ত করা হয়| এরপর খাবেন পুরুষ ও মহিলারা | কদাচিত তাঁরা একসাথে খাবার নেন | সীমিত বসার স্থান থাকার জন্য প্রায় সব সময় পুরুষদের আগে খাবার খেতে ডাকা হয় | এক জায়গায় মেয়েরা আগে দাঁড়িয়ে খাবার নিতে শুরু করেছিলেন| তখন পুরুষদের কাছে এটা অবাক লেগেছে| তাঁরা চুপচাপ দেখে গেছেন! পুরুষ ও মহিলারা যদি পালা বদল করা শুরু করেন সেটা মন্দ হবে না|

বাড়ির রাঁধুনিকে আগে খেতে দেখা যায় না | সারাদিন না খেয়ে থাকলেও তার প্রতি কারো করুণা হয় না | শাশুড়ি বা বাড়ির অন্য কোন গুরুজন যদি কট্টর হন, তিনি কাউকে লক্ষ্য রাখতে বলেন যেন তাঁদের বৌমা আগে খেয়ে তার স্বামীর অমঙ্গল না চায় | পক্ষান্তরে, নববধূ না খেয়ে আছে আর স্বামী বাইরে থেকে খেয়েদেয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ালে কেউ কিছু বলেন না! খাবার পর্যাপ্ত থাকলে যে যখন খেতে আসবে সে তখন

খাবে | কারো জন্য অন্য কাউকে সারাদিন উপোসী থাকার প্রয়োজন আছে কি?

বাঙালি অতিথিদের মধ্যে যাঁরা সময়মত আসেন তাঁদের সংখ্যা খুব কম | সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন কোন একজন প্রভাবশালী মানুষের জন্য সবাইকে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে থাকতে হয় | নিমন্ত্রণদাতা লোকটিকে কোনমতেই চটাতে চান না | আমাদের সৌভাগ্য যে সমাজে শুধুমাত্র দু-একজন এরকম মানুষ চোখে পড়ে | তাঁদের দেরী করে আসাটা যেন একটা নিয়মের মধ্যে পড়ে | তাঁরা এসে সবাইকে ধন্য করেন, কেননা তাঁদের এসে পড়ায় খাওয়া দাওয়া শুরু করা সম্ভবপর হয়|

অনুচিন্তন

কিছু লোককে যখন কোন খাবারের খুব বেশী সুনাম বা অভিযোগ করতে দেখি, তখন মনে হয় তাঁরা সময়ের অপচয় করছেন | খাবার জিনিসটা স্থানভিত্তিক অথবা ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনে করলে ঐ মানুষগুলো এত বাড়াবাড়ি হয়তো করতেন না | কেউ ইলিশ মাছের আয়োজন না থাকলে 'কী খেলাম?' বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন | কেউ পোস্ত দিয়ে অন্তত একটি পদ থাকাটা খুব প্রয়োজন মনে করেন | পোস্ত না হলে খেয়ে তুষ্টি কোথায়? বিপরীতে, কেউ যা আছে তা খেয়ে সবকিছু খুব সুন্দর ও অদ্ভুত হয়েছে বলে রাঁধুনির প্রশংসা করেন | সবার কথার বিপরীতে যুক্তি আছে|

বাঁচার জন্য সবাইকে খেতে হয় | যেখানে যা জোটে মানুষ তাই খায় | কে কী খান তার সমালোচনা করা কিংবা খাওয়ার সময় অন্যের দিকে তাকানোটাই বড় অন্যায় | যে যেমন করে খেতে চান, অথবা যার যেটা খেতে ভাল লাগে তা খেতে দিলে ক্ষতি কোথায়? যে খাবার একজনের প্রিয়, তা অন্য লোকের পছন্দ নাও হতে পারে | খাদ্যের ব্যাপারে কারো পছন্দ-অপছন্দের উপর কোন কথা বলা অবান্তর নয় কি?

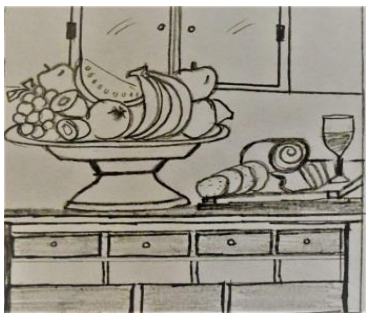

অনুমান

পুষ্পা সাক্সেনা (অনুবাদ: সুজয় দত্ত)

"হ্যালো"- ফোনের রিংটোনটা বেজে উঠতেই ফোন কানে লাগালো শীতল|

"কী, 'থ্রি ইডিয়টস' ছবিটা কেমন দেখলেন? সিনেমাটা পুরনো হয়ে গেল, তবু তার প্রতি আপনার আকর্ষণ গেল না | কতবার দেখা হ'ল এই নিয়ে?" ওপ্রান্ত থেকে হালকা হাসি ভেসে এল|

"হ্যালো, আপনি কে কথা বলছেন?" শীতল চিনতে পারে না গলাটা|

"ধরে নিন আরেকজন ইডিয়ট-ই প্রশ্নটা করছে |" অপরপ্রান্তে আবার হাসি|

"দেখুন, হয় আপনার নাম বলুন, নয়তো আমি ফোন রেখে দিচ্ছি | দুনিয়ায় ইডিয়ট কম নেই | তার মধ্যে থেকে আপনাকে চিনব কী করে?"

"না না না, একদম ওই ভুলটি করবেন না | আচ্ছা, আমি যে প্রশ্নটা করলাম তার জবাব দিলেন না তো?"

"তোমার আজেবাজে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো ফালতু সময় আমার নেই, ইডিয়ট কোথাকার!" বলে শীতল ফোনটা বন্ধ করার আগেই ওদিক থেকে শোনা গেল, "সরি ম্যাডাম, ভুল করছেন | জিনিয়াস ইডিয়ট বলা উচিত | দেখছেন কত সহজে আপনার মোবাইল নম্বর কব্জা করে ফেলেছি?"

"এতে বাহাদুরির কী আছে? তোমার মতো নিষ্কর্মা ছেলেদের ওটাই তো কাজ | বন্ধুমহলে তারিফ পেতে মেয়েদের নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর জোগাড় করে তাদের এইভাবে বিরক্ত করা | কিন্তু একটা কথা বলে রাখি - দ্বিতীয়বার যদি ফোন করেছ, আমি সোজা পুলিশে রিপোর্ট করব | মজা টের পাবে তখন |" রেগে ফোনটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে শীতল|

এম এ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী শীতল লাবণ্য আর মেধা - দুই ধনেই ধনী | এমন নয় যে ছেলেছোকরারা ওকে দেখে টুকরোটাকরা মন্তব্য ছুঁড়ে দেয় না বা বাড়ী ফেরার সময় ওর পিছু নেয় না, কিন্তু মেয়েটার একটা গাম্ভীর্যের কবচ আছে যা ওসব জিনিসকে একদম বাড়তে দেয় না | ওকে নিজের করে পাবার বা ওর সঙ্গে সময় কাটাবার স্বপ্ন মনে মনে লালন করে - এমন যুবকের সংখ্যা কম নয় | তবে আজ অবধি কেউ এরকম ফোন

করার সাহস দেখায়নি | মা-বাবার একমাত্র সন্তান ও, তাঁদের আদরযত্নে মানুষ, তবু মনের সব কথা তো আর তাঁদের খুলে বলা যায় না | সেটার জন্য আছে প্রিয় বান্ধবী পূজা | ওদের পারস্পরিক বোঝাপড়া দারুণ | আজ যখন শীতল থমথমে মুখে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছে, পূজা এক ঝলক দেখেই বুঝে গেল তার বন্ধুকে ঠিক 'শীতল' লাগছে না, তার পারদ চড়ে আছে | সে হেসে জানতে চাইল, "কী ব্যাপার? অমন ফর্সা মুখ আজ কালো লাগছে কেন?"

"দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমায় কী করে সিধে করতে হয় | নিজেকে হিরো ভাবো, না? আবার রগড় হচ্ছে – 'জিনিয়াস ইডিয়ট'? সাহস থাকে তো সামনে এসে বলো না - জিনিয়াসগিরি বের করে দেব |"

"কার কথা বলছিস? কাকে সিধে করবি?" পূজা বোকার মতো তাকিয়ে থাকে |

"ছিল কেউ একটা | নাম বলার হিম্মত নেই | কে জানে কোথা থেকে খবর পেয়েছে আমি 'থ্রি ইডিয়টস' দেখতে গিয়েছিলাম! ফোন করে জিজ্ঞেস করছে সিনেমা কেমন লাগল |"

"ব্যস, তাতেই এত রাগ? বলে দিলে পারতিস - ফিল্ম ভাল লাগুক না লাগুক তাতে তোমার কী বাছাধন? যাকগে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে ও জানল কোথা থেকে? দেখ, তোরই কোনো অ্যাডমায়ারার হবে - হয়তো সিনেমা হলে দেখেছে তোকে | কিন্তু তুচ্ছ ব্যাপারে এত রেগে যাওয়া তো ভালো নয়, মাই ডিয়ার | হায়রে, আমায় যদি কেউ ফোন করে একটু ফ্লার্ট করত! কী আর করা যাবে - ভগবান যত সৌন্দর্য সব তোকেই দিয়েছেন |" পূজার মুখে দুষ্টুমিভরা হাসি |

"ঠিক আছে, জানা রইল | এবার আমায় কেউ ফোন করলে তোর নম্বরটা দিয়ে দেব | এখন ক্লাসে যাবি, না আজও আবার কফি খাবার জন্য ক্লাস কাটবি?"

"আমার কি আর এমন সৌভাগ্য আছে যে তুই আমার সেই গর্হিত কাজের সঙ্গী হবি? অগত্যা আবার ক্লাসে গিয়ে সেই একঘেয়ে লেকচার মুখ বুজে সইতে হবে | দূর, কেন মরতে এই হিস্ট্রি অনার্স নিয়েছি বলতে পারিস? রোজ রোজ অতীতের কবর খোঁড়া, মুখস্থ করা আর ওগরানো |"

"তোর এই চিন্তাধারাটাই ভুল, পূজা", বন্ধুর অনিচ্ছাভরা চেহারা দেখে হেসে বলে শীতল, "একটু ভালবেসে, মন দিয়ে পড়লে ইতিহাস থেকে কত রোমান্স আর থ্রিল পাওয়া যায় জানিস? চল, এবার সত্যি দেরী হয়ে যাচ্ছে |"

ব্যাজার মুখে ক্লাসের দিকে হাঁটা লাগায় পূজা |

সে-রাতে মোবাইল বাজার শব্দে হঠাৎ ঘুম ভাঙল শীতলের | মনে একটা সুতীব্র আশংকা জাগল ওর - বাড়ী থেকে কেউ ফোন করেনি তো? যেদিন থেকে ও উচ্চশিক্ষার জন্য বাড়ী ছেড়ে এই নতুন শহরে এসেছে, মনে সবসময়েই মা-বাবার জন্য একটা চিন্তা থাকে | প্রথমদিকে তো একা একা হোস্টেলে থাকতে একদম ভাল লাগত না | এখন পূজার সঙ্গে বন্ধুত্ব আর ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় বাড়ীর জন্য মন কেমন করাটা কমেছে |

"পিছনের জানলার পর্দাটা একটু তুলে দেখুন! মুগ্ধ হয়ে যাবেন | আহা, কী দৃশ্য! প্লীজ এ জিনিস মিস করবেন না - আমি অনুরোধ করছি |" আবার সেই সকালের গলা |

"পাগল না মাথা খারাপ যে রাত দুটোর সময় বাইরের দৃশ্য দেখব? রাত জেগে ওসব করা তোমার মতো বেহায়া বেল্লিকেরই সাজে | মনে হচ্ছে তুমি নিজে থেকে ঠিক হবে না, আমাকে বাধ্য হয়ে অ্যাকশন নিতে হবে |" বলে ও ফোন বন্ধ করে দিল ঠিকই, কিন্তু মনে মনে প্রশ্নটা রয়েই গেল - এমন কী দেখাতে চাইছিল ছেলেটা যে এই গভীর রাতে ওকে ঘুম থেকে জাগাতে হ'ল? বালিশ থেকে মাথা তুলে মাথার কাছের জানলার পাতলা পর্দা দিয়ে বাইরে একবার তাকাবার লোভ সামলাতে পারে না ও | পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে বাইরেটা, গাছপালাগুলো নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না-স্নান করছে | মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই | বিছানা ছেড়ে উঠে খিড়কী দরজার পাশে দাঁড়াল আরো ভালকরে দেখবে বলে | ওর অন্তরের কবিসত্তা জেগে উঠল | কবিতার কয়েকটা লাইন সবে মনে মনে সাজিয়েছে, আবার মোবাইলের ঝনঝনানি |

"বিশ্বাস হ'ল তো, কেমন অপূর্ব দৃশ্য? দেখে নিশ্চয়ই কবিতা-টবিতা আসছে মাথায়? এলে কিন্তু কৃতিত্বটা আমার", আবার সেই হাসি |

"কতজনের ঘুমের বারোটা বাজিয়েছ এখনো অবধি? তোমার নম্বর কিন্তু আমার মোবাইলে এসে গেছে | এবার ব্যবস্থা করছি তোমার |"

"তাই নাকি! অবাক করলেন আপনি | বলেছিলাম না আমি জিনিয়াস? আমায় যদি কোনোদিন ধরতে পারেন, যা শাস্তি দেবেন খুশি হয়ে নেবো | এমনিতেই কাল আকাশ-নীল সালোয়ার-কামিজে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছিল নীল আকাশে

চাঁদ ঝলমল করছে। আচ্ছা, আপনার প্রিয় রং কোনটা বলুন তো? না বললে কিন্তু আমি ঠিক জেনে নেবো। যাকগে, এতক্ষণ ধরে আমার কথা শোনার জন্য ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।"

কেটে গেল ফোন।

আবার বিছানায় গিয়ে শোয় শীতল, কিন্তু ঘুম আর আসে না। হঠাৎ এমন ভুল করে বসল কেন ও - একজন অজানা অচেনা লোকের ফোন সঙ্গে সঙ্গে কেটে না দিয়ে এতক্ষণ ধরে কথা বলতে গেল কেন? লোকটা ওর জামাকাপড়েরও খবর রাখে। খুব সম্ভবতঃ ওর হোস্টেলেরই আশপাশে ঘুরঘুর করা কোনো বখাটে বেকার। কাল ওর ফোন নম্বর দিয়ে ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। অনেকবার এপাশ-ওপাশ করার পর শেষরাতে ওর ঘুম এল। কিন্তু সাতসকালে মায়ের ফোনে আবার তা ভেঙেও গেল।

"কী হ'ল মা? এত সকালে? বাড়ীর সব ঠিকঠাক আছে তো?"

"সব ঠিক আছে। তুই উঠিসনি এখনো? তোর সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।"

"কী ব্যাপার?"

"দেখ, কিছুদিনের মধ্যে ইন্দ্রনীল বলে একটা ছেলে তোর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। ওর সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলিস, কেমন? ওর সম্বন্ধে যা যা জানতে চাস, সব জেনে নিস্। বিরক্তি-টিরক্তি বা মেজাজ-টেজাজ দেখিয়ে ফেলিস না যেন।"

"কেন, তোমার কি ধারণা আমি লোকজনের সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলতে শিখিনি? আচ্ছা, এই ছেলেটা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে কেন? তুমি আবার আমার বিয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করোনি তো? আমি কিন্তু এখন বিয়ে-টিয়ে করতে পারব না।"

"ব্যস ব্যস, অনেক পাকামি হয়েছে। তুই নিজেই বলেছিলি পড়াশোনা শেষ হলে তবে বিয়ে করবি। তোর এম এ ফাইনাল তো আর দুমাস বাদেই শেষ। এবার যদি আমার কথা না শুনিস, আমি কিন্তু তোর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেব বলে দিলাম।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। ওঃ! তা, তোমার এই ইন্দ্রনীল ঠিক কেমন চীজ?"

"আরে, ও তো হীরের টুকরো ছেলে। ওকে ভালো না বেসে পারা যায় না। এমন করে আমার সঙ্গে মেশে যেন কত বছরের চেনা। আর সবাইকে খালি হাসাবে। অস্ট্রেলিয়ার একটা বড় কোম্পানীতে সফটওয়্যার এঞ্জিনিয়ারের চাকরি নিয়ে যাচ্ছে; যাবার আগে ওর মা চান ও বিয়ে করুক। ওর সঙ্গে পরিচয় হোক, নিজেই দেখিস আমি সত্যি বলছি কিনা।"

"তার মানে ওর মা ভয় পাচ্ছে ও কোনো অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে বিয়ে না করে ফেলে।"

"আবার বাজে বকা শুরু করলি? এটা জেনে রাখ, তুই যদি আমার এই কথাটা না শুনিস, আমিও ভবিষ্যতে তোর কোনো কথা শুনব না।" এবার মা'র গলায় বকুনির আভাস।

"ঠিক আছে বাবা, চিন্তা নেই। আমি তোমার ইন্দ্রনীলের সঙ্গে দেখা করব আর কোনো উল্টোপাল্টা ব্যবহারও করব না। এবার খুশী? আচ্ছা, ই-ন্দ্র-নী-ল - এত বড় নাম না হয়ে একটু ছোট হতে পারত না?"

"সে তুই বিয়ের পর ওকে যা খুশি নামে ডাকিস, আমার কিছু বলার থাকবে না। যা, এবার তোর কলেজের সময় হয়ে আসছে, তৈরী হ। আমার কথাগুলো খেয়াল রাখিস।"

"তোমার কথা খেয়াল রাখিনি এমন হয়েছে কোনোদিন? বাবাকে আমার প্রণাম দিও।"

ফোন রেখে তৈরী হতে বাথরুমে ঢোকে ও। কে এই ইন্দ্রনীল, যে মাকে এভাবে জয় করে নিয়েছে? এমনিতে ওর বিয়ে করার সত্যিই কোনো তাড়া নেই, কিন্তু মা যা বলল সেসব শুনে মনে একটা তীব্র কৌতূহল জাগছে - একবার দেখেই নেওয়া যাক কে এই মনমোহন ব্যক্তিটি। ব্যাপারটা পূজার সঙ্গেও একবার আলোচনা করা দরকার, এইসব ভাবতে ভাবতে রওনা দেয় ও। মা'র ফোনের জন্য বেরোতে একটু দেরীই হয়ে গেল আজ, ক্লাসের আগে পূজার সঙ্গে ক্যান্টিনে আর দেখা করা হবে না। ও বেচারি হয়তো শীতলের জন্য অপেক্ষা করছে ওখানে।

"কিরে, আজ ক্যান্টিনে এলি না যে? তোর সেই নতুন প্রেমিকের ফোন এসেছিল বুঝি?" দেখা হতেই হাসতে হাসতে শীতলকে জিজ্ঞেস করল ও।

"এসেছিল, তবে রাত দুটোয়। আমায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখাতে। তবে সত্যিই সেই দৃশ্যটা খুব সুন্দর ছিল। না দেখলে খুবই আফসোস হতো, মিস করতাম। মনে হচ্ছে মশাইয়ের একটু কবিতা-টবিতার শখও আছে। আমার সম্বন্ধে দেখছি অনেক কিছু জানে, এমনকি এটাও যে আমি কবিতা লিখি।"

"তবে আর কী, মনের মতো প্রেমিকই তো পেয়েছিস শীতল!"

"সাচ্চা প্রেমিকের তো নিজের নাম ঠিকানা লুকোবার দরকার পড়ে না রে। একটা কথা অবশ্য সত্যি যে লোকটার অনুমান-ক্ষমতা খুব প্রখর। কে জানে লুকিয়ে লুকিয়ে কোথা থেকে বা

কার কাছ থেকে আমার সম্বন্ধে এত খবর পায়। এতটাই যে আমি কী রঙের জামাকাপড় পরি সেটাও ওর মনে থাকে।"

"ঝেড়ে কাশ তো শীতল - তুই ওর সঙ্গে কথা বলা এনজয় করিস, না করিস না?"

"ও যখন ফোন করে, তখন তো রাগ হয়। কিন্তু পরে কথাগুলো মনে পড়লে খুব হাসি পায়। তাছাড়া ও আজ অবধি কখনো কোনো অশ্লীল কথা বলেনি - রাস্তার বখাটে ছেলেরা যেটা হামেশাই করে।"

"নাঃ, আমার তো লোকটাকে সাচ্চা প্রেমিকই মনে হচ্ছে। সামলে-সুমলে থাকিস ভাই।"

"আরে দূর, আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? ছাড় ওসব কথা। আজ মা'র ফোন এসেছিল। কী বলল জানিস? আমার বিয়ের জন্য আমাকে নাকি একজন দেখতে আসছে। বুঝতে পারছি না ঠিক কী করা উচিত। জানি না মা-বাবারা তাদের মেয়েকে যত তাড়াতাড়ি পারে বিদায় করতে চায় কেন।"

"বাঃ, এ তো দারুণ খবর! কে সেই ভাগ্যবান, যে আমাদের শীতলের হাত ধরতে চলেছে? ইস, আমার বিয়েটা যদি এই কলেজে আসার আগেই ঠিক হয়ে না গিয়ে থাকত –"

"কেন? নীতীন সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ আছে বুঝি? নাকি অন্য কাউকে পছন্দ হয়েছে মনে মনে?" শীতল ঠাট্টা করে।

"আরে না না, নীতীন তো খুবই ভাল ছেলে। আসলে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় আমি লাভ ম্যারেজ করি। বিয়ের আগের রোমান্সের মজাই আলাদা।"

"প্রেমটা নাহয় বিয়ের পরেই করলি। এদেশে আর কটা মেয়ে লাভ ম্যারেজ করার অনুমতি পায়? কোনো না কোনো অজুহাতে কেউ না কেউ এসে প্রেমের বন্ধন ঠিক ছিঁড়ে দেয়। আমার একটা কথা রাখবি পূজা - প্লীজ? ওই ইন্দ্রনীল ছেলেটা যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তুই আমার সঙ্গে থাকবি?"

"না বাবা, আমি কেন খামোখা 'কাবাব মে হাড্ডি' হতে যাব? আর কলেজের সব ডিবেট প্রতিযোগিতায় যে জেতে, সেই শীতল একটা ছেলেকে ভয় পেয়ে শিখন্ডী চাইছে - এ আবার হয় নাকি? চল, আজ এই সুখবরের অনারে ক্লাস কাটি দুজনে। চাট খাবি?"

"ঠিক আছে, আজ ইন্দ্রনীলের অনারে তোর কথাই শুনব।"

সেই সন্ধ্যায় শীতল হোস্টেলের ঘরে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই মোবাইল বাজল।

"ক্লাস কাটা তো ভাল অভ্যেস নয়। বিশেষ করে আপনার মতো মেয়ের কাছে তো এ জিনিস কখনই আশা করা যায় না। কী, কোনো দারুণ খুশ-খবর উদযাপন করার ব্যাপার ছিল নাকি?"

"দ্য হেল উইথ ইউ। আমি কী করব না করব, কোথায় যাব না যাব তাতে তোমার কী? আমাকে এভাবে জ্বালাচ্ছ কেন বলো তো? কেন সামনে আসছ না?" রেগে যায় শীতল।

"সরি, আপনাকে জ্বালানো আমার উদ্দেশ্য ছিল না।" বলেই ফোন কেটে দিল ছেলেটা।

শীতল ওর মোবাইলে ছেলেটার যে নম্বর উঠেছে তাই দিয়ে ওর খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দেখল প্রত্যেকবার আলাদা আলাদা ফোন বুথ থেকে ফোন করা হয়েছে। ঠিকই বলেছিল ও - ওকে ধরা বেশ কঠিন। বলিউডি সিনেমায় এক ধরনের 'রোমিও' থাকে যারা পাগলের মতো একটা মেয়ের পিছনে পড়ে থেকে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। শীতলের মাঝে মাঝে মনে হয় এই ছেলেটাও ঐরকম, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে কই - ওর কথাবার্তা তো ঠিক পাগল-দিওয়ানা টাইপ নয়! বরং বেশ শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা।

"আপনার সঙ্গে কে একজন দেখা করতে এসেছেন। ভিজিটিং রুমে বসে আছেন।" হোস্টেলের পরিচারিকা এসে খবর দিল।

"আচ্ছা, আমি আসছি।" বলে শীতল প্রথমেই তাকাল নিজের পোশাকের দিকে। এখন তো আর চেঞ্জ করার সময় নেই। এ নিশ্চয়ই ইন্দ্রনীল। হাত দিয়ে চুলটা একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে ও ভিজিটিং রুমের দিকে হাঁটা লাগাল।

সেখানে এক সৌম্যদর্শন যুবক অপেক্ষা করছিল। শীতলকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল সে। একনজর দেখেই শীতলের বুঝতে বাকী রইল না কেন এই ছেলেটার ব্যক্তিত্বে সবাই এত প্রভাবিত হয়ে পড়ে। পরনে স্লেট-রঙা স্যুট আর সাদা শার্ট, পায়ে পালিশ করা জুতো - পোশাকআশাক থেকেও ব্যক্তিত্ব ঠিকরে বেরোচ্ছে। মুখে একটা মোহন হাসি লেগেই আছে।

"বসুন বসুন। আমি শীতল, আর আপনি সম্ভবত ইন্দ্রনীল - তাই তো?" যতদূর সম্ভব মিষ্টি গলায় বলল শীতল।

"ও, আপনি তাহলে আমার দাদার প্রতীক্ষায় ছিলেন। সরি, ওকে একটা জরুরী কাজে শহরের বাইরে যেতে হ'ল। ও জানত আপনি ওর জন্য অপেক্ষা করবেন, তাই আপনাকে পছন্দ করার দায়িত্ব ও আমার ওপর দিয়ে গেছে। ও হ্যাঁ, আমার পরিচয়টা দেওয়া হয়নি। আমি নীলেশ - ইন্দ্রনীলের ছোট ভাই।"

"অদ্ভুত তো! আপনার দাদা তাঁর জায়গায় আপনাকে পাঠালেন? কেমন লোক আপনার এই সো-কলড দাদাটি?"

"আরে ওর গুণকীর্তন করতে গেলে তো ভাষাই খুঁজে পাওয়া মুশকিল | ও খুব গম্ভীর, তেজস্বী, মেধাবী, রুচিবান, যোগ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি আরো যে কত কী - তা বলে শেষ করা যাবে না | আমার ওপর ওর অগাধ আস্থা | তবে আমি ওর পায়ের ধুলোর যোগ্যও নই |"

"বুঝলাম, তিনি আপনার কথা-অনুযায়ী একেবারে গুণের খনি | কিন্তু যার সঙ্গে জীবন কাটাতে চাইছেন, তাকে একবার নিজের চোখে দেখাটাও জরুরী মনে করলেন না? এ আবার কেমনধারা বিশ্বাস? মনে হয় বিয়েতে ওঁর খুব একটা উৎসাহ নেই, তাই না?" শীতল স্পষ্ট গলায় নিজের মতামত ব্যক্ত করে |

"ও জানে যে আপনার সবরকম পরীক্ষা নিয়েই আমি আপনাদের এ বিয়েতে মত দেব | অবশ্য একটা কথা আমি এখনই জোর দিয়ে বলতে পারি - আপনি ওর জন্য একজন খুব উপযুক্ত জীবনসাথী | ও নিজেও বোঝে সেটা |"

"দাঁড়ান দাঁড়ান, কী বললেন? আপনি আমার পরীক্ষা নেবেন? আমার পরীক্ষা নেওয়ার আপনি কোথাকার কে?" শীতলের মুখ থমথমে হয়ে আসে |

"পরীক্ষা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, আর আপনি তাতে ফুলমার্কস পেয়ে পাশও করেছেন |" হাসতে হাসতে বলে ছেলেটা | এ হাসিটা কেন যেন খুব চেনা লাগছে? এমন হাসি আর কথা বলার ধরন যেন কার? আরে, এ সেই দিনরাত উড়ো ফোন করা ছেলেটার না! শীতল ভাবে, ওর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের একে চিনতে এতক্ষণ লাগল? এখন তো আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই |

"তুমি - তুমি সেই লোকটা না যে আমাকে বারবার ফোন করে বিরক্ত করে? এইসব করতে বলেছেন বুঝি তোমার ধীর, গম্ভীর, তেজস্বী দাদা? পরিষ্কার বলে দিচ্ছি - তোমার বা তোমার দাদার সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক আমি চাই না |" রেগে লাল হয়ে ওঠে ও |

"আচ্ছা, দাদার কথা ছাড়ুন, আমার সম্বন্ধে আপনার কী মত? শুনেছিলাম আপনার নাকি খুব রাগ | সত্যি বলছি, সারাজীবন আমি আপনার গোলাম হয়ে থাকব | বেশ ভাল চাকরি সেটা | আপনাকে জীবনভর সব সুখ-আহ্লাদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি |"

"সেকী? তোমার আদরণীয়, শ্রদ্ধেয় দাদাকে কী জবাবদিহি করবে? তোমার ওপর না তাঁর অগাধ বিশ্বাস? সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করবে? না হে শ্রীযুক্ত নীলেশ, তোমার দাদার মনে এত বড় আঘাত দিতে তো আমি তোমাকে দেব না | সত্যি বলতে কি, আমার ওই ভদ্রলোকের প্রতি সহানুভূতি জাগছে | যে মানুষটা নিজের ভাইকে এত বিশ্বাস করে, সে তার বৌয়ের তো সাত খুন মাফ করে দেবে | এইরকম লোকের সঙ্গে তাও সম্পর্ক পাতানো চলতে পারে |"

"অনেক ধন্যবাদ | আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন | আমি - আমি আরেকটু হলেই একটা বড় অপরাধ করে ফেলতে যাচ্ছিলাম | এখন আমার মূল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে | দাদাকে আপনার এই হ্যাঁটা আমি জানিয়ে দেব |" আবার সেই ফিচেল হাসি | এবার শীতল সত্যি চটে যায় |

"থ্যাংকস | আমি তোমার দাদার জন্য অপেক্ষা করে থাকব | তাঁকে বোলো আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক | চলি | নমস্কার |" বলেই নীলেশকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসে ও | হাসিমুখে সোজা গিয়ে হাজির হয় পাশের হোস্টেলে পূজার ঘরে |

"কিরে শীতল, তোর আলাপ আর পরিচয়পর্ব কেমন হ'ল? মনে হচ্ছে কেসটা জমে গেছে!" একচোখ ঔৎসুক্য নিয়ে জানতে চায় পূজা |

"আলাপ-পরিচয় ছাড়, আরও বড় খবর আছে | আজ সেই উড়ো ফোন করা ছেলেটার রহস্য সমাধান করে ফেলেছি |"

"সত্যি? কে ও? ওকে পুলিশে দিলি না কেন?"

"আরে ও তো আমার জন্য মা'র পছন্দকরা পাত্র ইন্দ্রনীল! ওর কথাবার্তায় বুঝলাম, নিজের ভাইয়ের ভেক ধরে মশাই আমার পরীক্ষা নিতে এসেছেন | আমিও মুখের মতো জবাব দিয়ে দিয়েছি | দেখি এবার আসল ইন্দ্রনীলকে কোথা থেকে জুটিয়ে আনে |"

"আরিব্বাস! তোর তো এটা 'প্রেম কাহানী' হয়ে গেল রে! তো লাগল কেমন তোর পাণিপ্রার্থীকে?"

"আমি তো এটা ভেবেই খুশী যে ওকে উপযুক্ত জবাব দিতে পেরেছি | এমনিতে দেখতে সুন্দর - বেশ হিরো-হিরো চেহারা | কথাবার্তায়ও চোস্ত | কিন্তু এবারই আসল মজা | আমাকে বোকা বানাতে এসে নিজেই কিছুটা বোকা বনে গেছে |" দুষ্টুমিভরা হাসি শীতলের মুখে |

"আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ও তোর মন চুরি করে নিয়েছে।"
পূজাও হাসতে হাসতে বলে।
"আজ্ঞে না, আমার হৃদয় অত সহজে চুরি করা যায় না। যাকগে, এখন চলি। মা'র ফোন আসতে পারে।"

ঘরে ফিরে বই খুলে বসলেও মন বসছিল না শীতলের। বারবার চোখের সামনে নীলেশের চেহারাটা ভেসে উঠছিল। ছেলেটার এখন কী রিঅ্যাকশন হবে কে জানে। নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবে না তো? যদি অন্য দিনের মতো আজও ফোন করে আর বলে, "আপনি মনটা খারাপ করে দিলেন। আমি কিন্তু অতটা বাজে লোক নই।" কিন্তু অনেক রাত অবধিও কোনো ফোন এল না। কাল রবিবার, অনেক বেলা করে উঠলেও অসুবিধে নেই - এই ভেবে শেষরাতের দিকে যেই শুয়েছে, মোবাইল বেজে উঠল। নিশ্চয়ই ওই ছেলেটার ফোন। কিন্তু ফোন কানে লাগিয়ে অপর প্রান্তে শীতল একটা গম্ভীর, ভারী গলা শুনতে পেল।
"হ্যালো শীতলজী, আমি জয়পুর থেকে ইন্দ্রনীল বলছি। ক্ষমা করবেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমি নিজে যেতে পারিনি। খুব জরুরী কাজ ছিল, কাটানো সম্ভব ছিল না। তবে আপনার সম্বন্ধে নীলেশ এত বিস্তারিত বলেছে যে ধরে নিতে পারেন আমিই আজ গিয়েছিলাম আপনার কাছে। ও আমাকে আপনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। খুব শিগগিরই দেখা করতে যাব আপনার সঙ্গে। আমার সম্বন্ধেও ও নিশ্চয়ই কিছু কথা বলেছে। আরো যদি জানতে চান, নির্দ্বিধায় জিজ্ঞেস করতে পারেন।"
"না। আপনার ভাই আপনার খুব প্রশংসা করেছে। একটা প্রশ্ন ছিল। আপনি ওর ওপর এতটাই বিশ্বাস রাখেন যে নিজের জীবনসঙ্গী বাছতে ওকে পাঠিয়েছেন? আপনি জানেন, ও আপনার বদলে নিজের সঙ্গেই আমার বিয়ের প্রস্তাব পেড়ে বসল?"
"আরে ওর কথা আপনি সিরিয়াসলি নেবেন না। মজা করাটাই ওর স্বভাব। যাইহোক, আপনি যে আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে আমাদের। নীলেশ জয়পুর থেকে আপনার পছন্দের রঙের শাড়ী নিয়ে যেতে বলেছে আমাকে। আনছি সেটা। এখান থেকে আর কিছু চাই?"
"থ্যাংকস। আমার আর কিচ্ছু চাই না। বাই।"
ফোন বন্ধ করতে করতে শীতলের কান্না পাচ্ছিল। এটা কী হয়ে গেল? ফোন সত্যিই জয়পুর থেকে এসেছিল। তার মানে ইন্দ্রনীল আজ আসেনি? তার মানে ইন্দ্রনীলকে ও দেখেইনি? তাকে সামনাসামনি না দেখে, না কথা বলে ও এই বিয়েতে সম্মতি দিয়ে বসল? ঠিক সেই সময় মা'র ফোন এল।
"আজ আমার সব চিন্তা দূর হয়ে গেছে রে। ইন্দ্রনীলের মতো জামাই অনেক ভাগ্য করলে মেলে। ও তোর সঙ্গে দোলের পর দেখা করার অনুমতি চেয়েছে। তোর ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক আগে যে প্রিপারেশনের ছুটি আছে, তখনই আসবে ও।"
"মা, আমার একটু ভুল হয়ে গেছে। আমি ইন্দ্রনীলকে বিয়ে করতে পারব না।"
"কী পাগলের মতো বকছিস! তুই নিজেই তো সম্মতি দিলি। কেউ তো আর জবরদস্তি করেনি?"
"ও তুমি বুঝবে না মা। আমি অন্য একজনকে –"
"আমার কিছু বোঝার দরকার নেই। অনেক ছেলেখেলা হয়েছে মন নিয়ে। আচ্ছা, আমি কী তোর শত্রু, শীতল? ইন্দ্রনীল সবদিক দিয়ে তোর উপযুক্ত। আর এই নিয়ে আমাকে উদ্বিগ্ন রাখিস না মা। ছেলেমানুষি ছাড়। কাউকে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আমার কথা বিশ্বাস কর, ইন্দ্রনীলের সঙ্গে তুই খুব সুখে থাকবি।" ফোন ছেড়ে দিলেন মা।
শীতল বুঝতে পারছিল না এখন কী করা উচিত। এ তো নিজের পায়ে কুড়ুল মারার মতো ব্যাপার হয়ে গেল। পূজাকে জিনিসটা বলতেও ও খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। শুধু একটাই পরামর্শ দিল - - ইন্দ্রনীলকে মনের কথাটা জানিয়ে দেওয়া। কিন্তু ফোন করে তো আর জানানো যাবে না। সে জয়পুর ছেড়ে চলে গেছে, বাড়ীর পথে এখন। এখন ও কবে দেখা করতে আসবে - তারই অপেক্ষা।

দেখতে দেখতে প্রিপারেশন উইকের ছুটি চলে এল। শীতলের মনে শান্তি নেই। ইন্দ্রনীল যে কোনদিন আসতে পারে ওর সঙ্গে দেখা করতে। ও কী ভদ্রলোকের মুখের ওপর বলতে পারবে যে তাঁকে নয়, ও তাঁর ভাইকে বিয়ে করতে চায়? ছুটির তিন দিন কেটে যাওয়ার পর একদিন সকাল সকাল পরিচারিকা এসে জানাল, "কে এক নীলবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এয়েচেন। পুরো নামটা যেন কী বললেন, মনে পড়ছে না।"
বুক ধুকপুক করছে শীতলের। কোনোরকমে সাহস সঞ্চয় করে ইন্দ্রনীলের সঙ্গে দেখা করতে গেল। গিয়ে যাকে দেখল,

এক্কেবারে চমকে গেল! সেই মোহন হাসি মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীলেশ। বেচারা শীতল কী বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না, এমন সময় নীলেশই মুখ খুলল।

"তারপর, কী খবর? চেয়েছিলাম দোলের দিন এসে আপনাকে রং মাখিয়ে দিয়ে যাব। পারলাম না আসতে। এখন শুধু চাই জীবনের সব সুখ, সব খুশী আপনাকে সর্বদা রঙিন করে রাখুক।"

"আজও কি ইন্দ্রনীলের বদলে তুমি ওঁর কাছ থেকে নতুন কোনো খবর নিয়ে এসেছ?"

"নাঃ, আজ সে তার জায়গাটা চিরকালের জন্য আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। দাদা হয়ে ভাইয়ের জন্য এটুকু করবে না? আসলে ও জেনে গেছে যে আপনি আমাকেই চান। আপনার পিছু নেওয়ার জন্য পুরো দশ দিন বাড়ীর বাইরে কাটিয়েছি শীতলজি। সত্যি বলুন তো, আমার ওই উড়ো ফোনগুলো আপনার খারাপ লাগত কী? আমার তো মনে হত আপনি ঐগুলোর জন্য অপেক্ষা করেন।"

"তুমি ভুল করছ। কারো বিকল্প হিসেবে তোমাকে কেন গ্রহণ করতে যাব? আমি তো ইন্দ্রনীলকে দেখা করতে আসতে বলেছিলাম, তার বিকল্পকে নয়–"

"ঠিক আছে, তাই যদি হয়, বলেই ফেলি শীতলজি - আমি কারো বিকল্প-টিকল্প নই। আমিই ইন্দ্রনীল - মা-বাবার বড় ছেলে। এবার বলুন, কী ইচ্ছে আপনার? সরি, আমি চেষ্টা করলেও আপনার সামনে ইন্দ্রনীলের কোনো ডামিকে হাজির করতে পারব না। আমার সে সাহস নেই। যাকগে, এই নীলকে দিয়ে কি চলবে?"

"তুমি এত বড় প্রতারক ইন্দ্রনীল! তোমাকে বিয়ের কথা তো ভাবতেই ভয় করছে।"

"আবার সেই ভুলটা করছ? আমি প্রতারক নই, জিনিয়াস ইডিয়ট। বলেছিলাম না, আমাকে তুমি ধরতে পারবে না?"

"কিন্তু ধরে তো আমি ফেলেছি। প্রথম দিনেই তো বুঝে ফেলেছিলাম তুমিই সেই উড়ো ফোনের ছেলেটা।"

"এটা তো বুঝতে পারোনি যে আমিই আসল ইন্দ্রনীল? নাহলে মাকে বলছিলে কেন, তুমি ইন্দ্রনীলকে বিয়ে করতে চাও না, অন্য কাউকে ভালবাসো? ধোঁকা খেয়ে গিয়েছিলে তো? মাকেও শেষমেশ পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে হ'ল, নাহলে ফোনে তোমার কথা শুনে উনিও খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন।"

"মেনে নিচ্ছি ওই জায়গাটায় আমি ধোঁকা খেয়ে গেছি। তবে এটাকে আমার হার বলে ভেবো না। আমার মাকে তুমি এমন মোহজালে জড়িয়েছ যে সেটা থেকে বেরনো মুশকিল। নাহলে কিন্তু –"

"নাহলে কিন্তু কী? তুমি কোনো এক বেচারা ইন্দ্রনীল - যে তার ভাইকে বিশ্বাস করে ঠকেছে - তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে? এইরকম ভুল যে করে, তাকে তো আমার হাতে শাস্তি পেতেই হবে।" ইন্দ্রনীলের মুখে মিচকে হাসি।

"আর কী শাস্তি দেবে, নীল? এতদিন ধরে আমায় ফোন করে বিরক্ত করেছ, শাস্তি তো আমার তোমাকে দেওয়া উচিত।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যেন জানি না ভদ্রমহোদয়া ফোনের জন্য কীরকম অপেক্ষা করে থাকতেন মনে মনে।"

"এটা তোমার ভুল, নীল। সেই সময় তোমাকে ধরতে পারলে হাতে ঠিকই হাতকড়া পরাবার ব্যবস্থা করতাম।" মুখে পরিহাসের হাসি ফুটিয়ে বলে শীতল।

"তা ভালই তো, এখন পরিয়ে দাও। তবে লোহার হাতকড়া নয়, প্রেমের বন্ধন। আর কয়েক মাস বা বছরের জন্য নয়, যাবজ্জীবন।" বলেই এগিয়ে এসে শীতলের মাথায় তার প্রথম চুম্বন এঁকে দিল ইন্দ্রনীল। আর শীতলের গোলাপী মুখে তখন সিঁদুরের আভা।

অতীত ও বর্তমান

সফিক আহমেদ

অতীতকে নিয়ে স্বপ্নবিলাসিতা আমার স্বভাব বিরোধী

গ্রামের শেষে বয়ে যাওয়া জলঙ্গি নদীতে কাঁচের মতো স্বচ্ছ জলে ডুব দিয়ে নিশ্বাস ধরে রাখার প্রতিযোগিতা
আলের ধারে বাঁশের মাচায় পা ঝুলিয়ে বসে সবুজ ধানক্ষেতের শেষে এক থালা কমলা সূর্যকে ডুবতে দেখা
মিশমিশে কালো অন্ধকারে বাঁশবাগানে চলতে গিয়ে দমকা হাওয়ায় হাতের হারিকেন নিভে যাওয়ার গা শিরশিরানি
কুপির আলোতে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে মায়ের বেড়ে দেওয়া ধোঁয়াওঠা লাল চালের ভাতের ম ম করা গন্ধ
এর কোনটাই আমার অতীত নয়, আমার বর্তমানেরই অংশ

স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখা, বন্ধুদের ঘাড়ে হাত রেখে চলতে চলতে হাত বদলে সিগারেট টানা
বয়সসন্ধির কৌতূহল মেটাতে নিষিদ্ধ বই পড়া আর বন্ধুদের অর্ধসত্য অর্ধকল্পিত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শোনা
মাঠে কাদামেখে খেলার পর দশ পয়সার রংবেরঙের বরফকুচির সরবত আর অকারণে মারপিট
দেখতে দেখতে নয়, দশ, এগারো ক্লাস, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা অভিভাবক মাস্টারদের চূড়ান্ত সতর্কীকরণ আর স্কুলের গন্ডি পার হওয়া
এ আমার অতীত নয়, আমার বর্তমানেরই অংশ

আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক উৎসব, রাত জাগা, পোস্টার লেখা, একটু আধটু নেশাভাং,
নতুন স্বাধীনতা, নতুন সম্পর্ক হওয়া বা ভেঙে যাওয়া,
শান্তিনিকেতনে খোয়াইয়ের ধারে ফটোগ্রাফি ক্লাবের আউটিং, ছবি তোলা, এক্সিবিশন, স্টুডেন্ট ইলেকশনের টানটান উত্তেজনা
শুশুনিয়া পাহাড়ে রক ক্লাইম্বিং করে সন্ধ্যাবেলা টিনের কাপে গরম চা নিয়ে আগুন পোহানো, সান্দাকফুর ট্রেকিং-এ
মেঘে-কুয়াশায় ঘেরা পাহাড়ি রাস্তায় চমরী গাইয়ের গলার ঘন্টার টুংটাং শব্দ আর পাহাড়ি ঝর্ণার জলের শব্দের সিম্ফনি
এ আমার অতীত নয়, আমার বর্তমানেরই অংশ

নায়াগ্রার অবিশ্রান্ত জলপ্রপাতের জলোচ্ছাসের স্পর্শ, আলাস্কার গ্লেসিয়ার বে-তে হিমবাহ খসে পড়ার শব্দ,
ডেনালির রুক্ষ পাহাড়ে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া বুনো ফুলের গন্ধ
ভূমধ্যসাগরে প্রমোদতরীতে ভাসতে ভাসতে দিগ্বলয় পর্যন্ত বিস্তৃত কালো জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব,
সুইস আল্পসের মনমুগ্ধকর দৃশ্য
এ সবের সঙ্গে দীঘা, পুরী, দার্জিলিংও আমার মধ্যে সমানভাবে বর্তমান

আমি বর্তমানের পূজারী আর বর্তমানের নির্যাস শেষ বিন্দু পর্যন্ত উপভোগ করি
আমি অতীতকে একা থাকতে দিই না, বর্তমানের গন্ডি বাড়িয়ে অতীতকে জড়িয়ে নিই
যেমন গতকালকে বর্তমানের গন্ডি বাড়িয়ে ভাবা যায় এই সপ্তাহ
গত সপ্তাহকে ভাবা যায় এই মাস, গত মাসকে এই বছর
তেমনি গন্ডি বাড়িয়ে সারা জীবনটাকেই বর্তমানে নিয়ে আসি
জানি বর্তমান যখন অবর্তমান হবে এক লহমায় সব - সব চলে যাবে অতীতের কাল গহ্বরে
তাই অতীতকে নিয়ে স্বপ্ন বিলাসিতা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ !

কবিতার আসাযাওয়া

সুজয় দত্ত

আয়োজন করে, আসর সাজিয়ে কবিতাকে যত ডাকি -
সে দেখি কেবল পালিয়ে বেড়ায়, বারেবারে দেয় ফাঁকি।
দু-চোখে যখন না-বলা কথারা ভীড় করে দলে দলে -
দু-ঠোঁটের মৃদু কাঁপনে হৃদয় তখন কবিতা বলে।

কত মাত্রার ছন্দে লিখেছ? পয়ার? অনুষ্টুপ?
বিতর্ক চলে তাত্ত্বিকদের, কবিতাই থাকে চুপ।
তর্কের শেষে সন্ধ্যা ঘনায়, একফালি চাঁদ ওঠে -
শ্বেতকরবীর কুঁড়িতে কুঁড়িতে হঠাৎ কবিতা ফোটে।

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বায়রন, কীটস, শেলী -
সারাটা জীবন মহাকবিদের জীবনী-ই পড়ে গেলি?
বুঝলি না হায় কবিতা থাকে না লিটারেচারের ক্লাসে?
মনের আকাশে মেঘ করে এলে তবেই কবিতা আসে।

বড় বড় সব প্রকাশনী, নামী কাগজে প্রচুর টাকা -
দশটা-পাঁচটা কবিতা লেখার চাকরিটা হোক পাকা।
অর্ডারি লেখার বাজারেতে চলে কবিতার কেনাবেচা -
ঝিনুকের খোলে ভরে শুধু হাত, মুক্তো হয় না ছেঁচা।

হৃদয়সাগরে ডুব যদি দাও, কান পাতো অন্তরে -
হয়তো বা কোন মায়াবী সকালে কার জাদুমন্তরে
খুলবে মনের বন্ধ দুয়ার, কত রঙে কত ছবি
আঁকা হবে অনুভূতির তুলিতে - জন্মাবে এক কবি।

ঘরে ফেরা

কমলপ্রিয়া রায়

বেলা যে নেমে এলো চল রে ঘর
সাঁঝেরবেলা জুড়ে কে মোরে ডাকে ফিরে
চল রে ঘর ওরে চল রে ঘর।
গিয়েছি কোন দূরে আমার ঘর ছেড়ে
সে যে অনেক দূর তেপান্তর
সেখানে আছে জানি একটি ছোট নদী
আমার প্রিয় নদী সাভানা নাম তার।
যখন একা থাকি নীরবে ভাবি মনে
নদীর ঢেউগুলি আহা, কি সুন্দর!
সদা কলরোলে ঢেউয়ের বোল তুলে
নদী ঘুরে ফিরে দেশান্তর।
নাই তার মনে কোনো জরাভার
নাই তার কোনো দুঃখ ক্লেশ
সদাই হাসিমুখে বহিছে সে নদী
বলিছে সবারে সে এই তো বেশ।
আজ এসে গেল যাবার শুভক্ষণ
চাহিনু তাই আজ নদীপানে
কহিল মৃদু হেসে মাধুরী মিশায়ে সে
এবার যাও চলে ঘর কোণে।
যেথায় পড়ে আছে তোমার মন আর
যেথায় জুড়ে আছে সব স্মৃতি
সেথায় সেই ঘর, তোমারি সেই ঘর
করো পূর্ণ তারে ঘিরে স্নেহ প্রীতি।
এসেছি ফিরে তাই হিউস্টনে আজ
যে আমারি ঘর চিরকালের
আনন্দবীণা মোর সদাই বাজে মনে
মধুর সুরে আর মৃদু তালে।

সত্যে সমার্থক, তুমি ও ঈশ্বর

সুমিতা বসু

সাতনার চুন পাহাড়ে সেদিন ছিল জ্যোৎস্না
সাদা দুধ-সাগরের ঢেউ আকাশে, আর তার সঙ্গে
পাল্লা দিয়ে উঁচু-নীচু পাহাড়গুলোও
ঝকমকে চুমকি দেওয়া শাড়ির আঁচল এলিয়ে
অলস ভাবে শুয়েছিল, এক পাশ ফিরে

ঠিক সেই সময়, তুমি এসে দাঁড়িয়েছিলে আমার পাশে
ঈশ্বর ছিলেন খোলা জানলার ওপাশে,
পৃথিবীতে সবাই তখন ঘুমিয়ে অগাধ
শুধু দূরে কিছু ঝিঁঝিঁ পোকার নহবত।
দৃষ্টি স্থির, হাতে হাত, স্মিত হাসি,
বলেছিলে,
সত্যাসত্য আপেক্ষিক, ক্ষণস্থায়ী
সুতো ছিঁড়ে গেলে আর জোড়া লাগে না
গিঁট থেকে যায় লাগাতে গেলেও ...
যা যাওয়ার, তাকে যেতে দিতে হয়
যদি বা ফিরে আসে, তবেই সে তোমার
না এলে, তা ছিলও না কোনদিন।

আরো বলেছিলে,
প্রকৃতির সত্তা বন্য অরণ্যে এই নিবিড় নীরবতা,
আবার, কাল সকালের আলোয় ভরা ব্যস্ততাও।
আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পর, মায়া হবে দুধ-পাহাড়
আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠবে পৃথিবী, সাতনার
আমরা সবাই জীবন-মরণ রঙ্গালয়ে
মুখোশ পরা কুশীলব, মগ্ন শুধু বিষয়-আশয়
সচেতন মন চলে যাবে নিজ নিকেতনে
পড়ে থাকবে তারাই, যারা তা না জানে।

যুগ যুগ পরেও তোমার সেই গলার স্বর
চেনা অচেনায় মেশানো, ভেসে আসে বুকের 'পর
অমোঘ সত্যে সমার্থক, তুমি ও ঈশ্বর
তবু, যদি বেছে নিতে হয় সত্বর
গিঁট আছে জেনেও, অবলীলায় ছেড়ে ঈশ্বর
জ্যোৎস্নায় ভাসিয়ে দুধ-সাগর
তোমাকেই নেবো জীবনে আমার।

শুভ নারী-দিবস

পার্থ সরকার

প্রকৃতি আমি, আমি জন্মদাত্রী জননী;
মহাকাশচারিণী আমি, আমি দেহপসারিনী।
মন্দিরে সেবাদাসী আমি, আমি ভক্ত মীরাবাঈ;
রণাঙ্গনে ভয়ানক আমি, আমি রানী লক্ষ্মীবাঈ।
আমার সতীত্ব পরীক্ষা হয় জ্বলন্ত আগুনে;
ব্যাট হাতে বল পায়ে আছি আমি মাঠে- ময়দানে।
ভরা সভায় দুঃশাসনের হাতে, আমি দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা;
নিশীথ রাতে রোগীর পাশে আমি নাইটিঙ্গল সেবিকা।
জগত কল্যাণে ত্রিশূল হাতে,
অসুর নিধন করি;
পৃথিবীতে যত সুন্দর আছে,
তার বিরাট একটি ভাগ নারী।

দুরাশা না দুর্দশা

রঙ্গনাথ

হেড মাস্টার বলেন, দয়ারাম ভীষণ মেধাবী ছেলে
নিশ্চয় সে বিশাল বড় হবে একটু সুযোগ পেলে।

মাতা মৃত, পিতা মৃত্যুমুখী, দয়া দিশাহারা;
কিশোর বয়সেই তার জীবন যেন ছন্নছাড়া –
রোগজীর্ণ পিতা গয়ারামকে বাঁচানো চাই
পিতার মৃত্যু হলে তার আপন আর কেহ নাই!
জানে না হবে কিনা পরীক্ষার ফর্ম পূরণ
দুর্ভাগ্য আনছে তার ছোট-বড় স্বপ্নের মরণ
"টাকা নাই! সামান্য কিছু টাকা! টাকা চাই;
চাই সমাধান; যদি একটা উপায় খুঁজে পাই!"

গয়ারামের মুখটা ভরে গেছে চোখের জলে
সে ক্ষীণকণ্ঠে থেমে থেমে দয়ারামকে বলে –
"দয়া, গিয়েছিলাম গুরুনাথ মহাজনের কাছে
টাকা ধার পাইনি; তিনি বললেন আভাসে–
"সব জমি ভিটা লিখে দিলে কিছু টাকা পাবে;
ধার দিয়েছি বার বার; টাকা পাবে না সেভাবে –
ভেবে দেখলাম, তোমার শরীরের যা দশা
তুমি যে টাকা ফেরত দেবে, পাই না ভরসা"।

দয়ারাম ইতস্তত; পায় না ভেবে কী বলবে -
তার চিন্তা, টাকা পেয়েছে কিনা জানতে হবে।
"তাহলে, তুমি কি কিছু জমি দিয়েছ লিখে?
পেয়েছ কত টাকা? এটা ভাল একদিকে –
ডাক্তার বলেন, ওষুধ খেলেই অসুখ সেরে যাবে –
সুস্থ হলে কাজ করবে, টাকা আবার পাবে।
এছাড়া হবে আমার ফর্ম পূরণ, পরীক্ষা গ্রহণ।
ভূমিহীন হবে! বিকল্প তো নেই, এটাই কর বরণ।"

কাঁদো কাঁদো গয়ারাম বলে করুণ স্বরে
বড় আঘাত হেনেছি তোমার জীবনের পরে –
ভিটা বাদে সব জমি লিখে দিয়েও টাকা পাইনি
এমনটি যে হবে, সত্যি বলছি, আমি চাইনি!
গুরুনাথ বলেন, "কত পাবে সেটা করে নির্ভর
সুদসহ পাওনা টাকার হিসাব-নিকাশের পর।
নায়েব গেছে ব্রজপুরে, তারপর ঘুরবে তীর্থস্থান;
ব্যাপারটা জটিল, নায়েব ছাড়া হবে না সমাধান।"

নিরুপায় দয়া যায় গুরুনাথের কাছে
এছাড়া তার আর কিই বা করার আছে?
"ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ কিনতাম কিছু টাকা পেলে
বাবা মরণাপন্ন, আমি অনাথ হব সে মরে গেলে!
মহাজনবাবু দয়া করুন, আমার বাবাকে বাঁচান।"
গুরুনাথ রেগে আগুন, "এসেছ আমায় দিতে জ্ঞান?
আমার বাড়ির পাশে ভাঙা কুঁড়েঘর! কী কুৎসিত!
পাইনি ভিটাবাড়ি! সেথা দয়া দেখানো ছিল না উচিৎ?"

দুদিন পর গুরুনাথ জেনেছেন দয়ারাম পিতৃহীন;
জমি নিয়েও টাকা না দেওয়ায় অপরাধী, কিছুটা মলিন!
"আমার নাতির পাঁচটি মাস্টার, সে পাশ করতে অক্ষম!
খেতে পায় না, নেই কোনকিছু, তবু দয়া ক্লাশে প্রথম?
দয়ারাম করবে স্কুল পাশ! কেন তার এমন দুরাশা!
সে চাষীর ছেলে, উত্তম হবে সে যদি হয় খাঁটি চাষা!
বাবা-মা নেই, জমিজমা নেই, এমন তো আছে ভুরি ভুরি।
দয়ার শক্ত দেহ, মন্দ হবে না সে যদি করে দিন-মজুরী।"

নেই সে ভাঙা কুঁড়েঘর; গুরুনাথের বাড়ি হয়েছে সুন্দর!
দয়ারাম ছেড়েছে স্কুল, ছেড়েছে গ্রাম, এখন দেশান্তর।

(হাইস্কুলে আমার এক শ্রেণী নীচের প্রথম ছাত্রকে স্মরণ করে)

রাইকিশোরী আজও মরে যন্ত্রণায়

কৃষ্ণা গুহ রায়

কুঞ্জবনে রাইকিশোরীর ঠোঁটে,
কতদিন মীড় তোলেনি শ্যামসুন্দর।
যমুনার নীলজল ফাগ উৎসবে,
বহুদিন রঙিন হয়নি দুঃসাহসী সোহাগে।
আকাশের কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আর
কলাপীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ করে
রাই যে আজও বিচলিতা।
বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস থেকে সহকবিদের
লেখনী মূর্ত হয়ে চলেছে,
একের পর এক বিরহ কাব্যে।
ওগো উন্মাদিনী রাধা,
মৃত্যুও যে তোমার ঘুঙুর হবার ভয়ে
বেজেছিল ঝুলনস্মৃতির রাতের অবক্ষয়ে।
তুমি আজও হৃদযমুনায় তুফান তুলে
হও যে সমর্পিতা।
বিষণ্নতার বিষ তখন ভালবাসার অপেক্ষায়।

মনসংগীত ১

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

কিছুই তো হ'ল না করা
এ জীবনে,
এলোমেলো ভাবনা,
অগোছালো কর্মে
পূর্ণ হ'ল প্রাণমনে।

শৈশব শেষ হ'ল চঞ্চল খেলাতে
কৈশোর গেল চলে স্বপ্নের ভেলাতে
যৌবন যায় বুঝি যুযুধান মতিতে
অস্থির অন্তর ক্ষণে ক্ষণে।

ফিরে দাও শৈশব অনাবিল হাসিতে,
কিশোরের প্রাণ দাও স্বপ্নের ডালিতে,
যৌবন যেন যাচে প্রেমে তবে সঙ্গ,
জীবন ভরুক সৎ কর্মের সাজিতে -

ভাবনার ভাব যেন সদা হয় তোমাময়,
মিথ্যের মায়াজালে সত্যের হোক জয়,
পুণ্যের পরশে তব পাপ যত হোক ক্ষয়,
সকল কর্ম মম
যাক তোমাপানে।

দুঃখ

শঙ্কর তালুকদার

হে দুঃখ
তোর কি পরিতাপ,
সবারে ধ্বংস করে
যদি পাস্ আনন্দ মনে
আয় কাছে আয় বুকে
তোরে করি পালন।

মাতা যেমন বুকে ধরে
আপন সন্তানেরে
সস্নেহে আদর করে
আপন দুধ করায় পান,
তোরে আমি দেব
সেই সম্মান।

আমার রক্ত দেব তোরে
নীরবে অঞ্জলি ভরে,
শিরা-উপশিরা
যায় যদি যাক ছিঁড়ে
অম্লান বদনে তবু
করব পোষণ।

রাত-দিন থাক কাছে
করব না শাসন
হীন মনে পিছু চেয়ে
দেব না বাধা তোরে
জীবনের যা কিছু আছে
কর শোষণ।

তোর দুঃখ যত
নেব আপন করে
আপন দুঃখের তরে
না করি পরিতাপ,
তুই ভাল থাক
আর সব যাক ভেসে যাক।

····◆❁◆····

মনসংগীত ২

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

কোটি রবির আলোর মাঝে
পথটি তাঁহার চিনে ,
এলেন নাথ আশিস নিয়ে
তোমার জন্মদিনে।

ধন্য হ'ল ভূমি, বারি,
ধন্য হ'ল আকাশ
ধন্য হ'ল জীবাত্মা সব
ধন্য হ'ল বাতাস -
ধন্য হল ফুলের সুবাস
তোমার পুণ্যদিনে।

সুস্থ থাকো, সবল থাকো,
শুদ্ধ থাকো মনে -
শতায়ু হও, হও দয়াবান
পবিত্র হও প্রাণে -

দৈব কৃপায় নম্র হৃদয়
ধন্য করুক তাঁরে
সাজিয়ে রাখুক স্রষ্টা তোমায়
সত্য-ন্যায়ের হারে -
জন্মদিনের আশিস ঝরুক
অন্য সকল দিনে।

····◆❁◆····

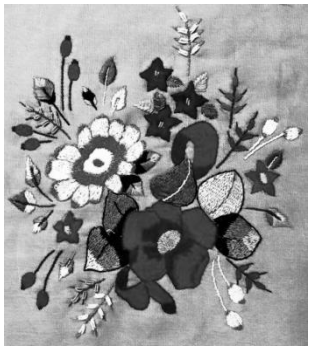

কিছু দরজা

উদ্দালক ভরদ্বাজ

কিছু দরজা দেখলেই মনে হয়
যেন, খুললেই পৌঁছে যাওয়া যাবে
অলীক বারান্দায়।
আদিগন্ত-ছড়ানো, ফুটবল
মাঠের মতো ঘাসজমি;
ঝাঁকড়া আঁশফল গাছটার পাশে
রুপোলী রেলিঙের দেয়াল,
এমনকি বড় মাঠের কোণের
সেই বিরাট বাদাম গাছগুলোও,
সব যেন ম্যাজিকের মতো দাঁড়িয়ে ...
ঝকঝকে, দুধ-সাদা
কুয়াশার চাদর গায়ে,
ঘাসজমি পেরিয়ে,
কে যেন এসে পড়বে -
গরম জিলিপির ঠোঙা হাতে।

কিছু কিছু দরজা দেখলে
এরকম মনে হয়, বার বার।

কিছু কিছু মনও, অবিকল
এই সব দরজার মতন।
মনে হয়,
কোনমতে খোলা যায় যদি
বাধার নিষেধ,
তাহলেই পাওয়া যাবে
সেই হাওয়া;
শিশিরসিক্ত প্রেম,
ভালবাসা, করুণায় মাখা।
মনজমি,
ঘাসের সবুজ কিনারায় -
স্বপ্নের লুকানো-কান্নার মতো,
সমস্ত বিষাদ-মোছা উপশম নিয়ে
কে যেন দাঁড়িয়ে।
সম্ভ্রমের বাধা,
লাজের মুখোশ,
অন্যায্য অনুনয় পেরোলেই,
পাওয়া যাবে তাকে।

অথচ, যেমন কিছু দরজা,
সুনীল আকাশের প্রত্যাশা-জাগানো
ভোরের বদলে
চোখের আঙ্গিনায় আনে আবর্জনা,
আঁস্তাকুড়,
ভলকে ভলকে পুতি গন্ধ।
তেমনই, কিছু মন,
খুলে ফেলে
শুধুই বিষণ্ন রক্তপাত;
অনুদার, আবিল ক্রোধ
ক্লিন্নতা-মাখা ...

আমি তাই,
বন্ধ দরজা খুলি না এখন।
আমি তাই,
বাহারি পর্দার রঙে,
সাজিয়ে দিই নিখুঁত টেরাকোটা,
সমুদ্রঘ্রাণ, বৃষ্টির পাতা,
ভিজে বালি ⋯
নূপুরের মৃদু গন্ধ-মাখা।
না-খোলা দরজার বুকেই
পেয়ে যাই সাজানো সৌষ্ঠব।
মোহের বারান্দার বাইরেই
আর এক মোহের তীর্থ
অবসন্ন যাত্রীর চোখে
মোহনার শেষ রঙের মতো।

হিমালয়পুত্র পেম্বা

ডলি ব্যানার্জী

দুর্দান্ত সাহসী পরোপকারী -
বার বার এভারেস্ট জয়ের শিরোপা যার
সেই নেপালী পর্বতারোহী পেম্বাকে নিয়ে কবিতা আমার,
যার কথা ইতিহাস লিখবে না, লিখবে না কেউ আর।

কিছু বাঙালি অভিযাত্রী জানে
পেম্বার পরিচালনায় নিশ্চিত পর্বতারোহণ,
ডাক পড়ল, আরও দুর্গম নন্দাগিরি অভিযান।
ঘরে লাকপাডোমা, ওর কিশোরী ঘরণী অন্তঃসত্ত্বা -
সায় দেয় না ওর অন্তরাত্মা
অপরদিকে পাহাড়ের দুর্নিবার আকর্ষণ
গরিব পিতার ভাবী শিশুর রক্ষণাবেক্ষণে অর্থের প্রয়োজন।
ব্যথাতুর মনে পা বাড়ায় হিমালয়ের পথে -
চোখের জলে ভেসে যায় কিশোরী লাকপার মুখ
কবে আসবে জীবনসঙ্গী পেম্বা - সেই আশায় বাঁধে বুক।

হিমালয়ের অতর্কিত প্রলয়ঙ্করী তুষারঝড়ে
সহযাত্রীরা পড়ে যায় পাহাড়ের বিশাল কোটরে।
আপন প্রাণ তুচ্ছ করে পেম্বা ঝাঁপ দেয় তাদের প্রাণ উদ্ধারে।
তার তরুণ, তাজা, প্রাণবন্ত প্রাণ
নিমেষে হয়ে গেল বলিদান।
পেম্বার বুকফাটা অন্তিম ক্রন্দন
নন্দাগিরি, ধবলগিরি, মাউন্ট এভারেস্টের কোণে কোণে
ফেলে নিবিড় স্পন্দন।
স্বার্থান্বেষী বন্ধুরা বিজয়রথে চেপে গেল আপন নিকেতন।
শিশু থেকে বর্ষীয়ান দার্জিলিঙের পথে প্রান্তরে শোকে মুহ্যমান।
আকাশে বাতাসে তাদের অস্ফুট ক্রন্দন।

নন্দাগিরির সফল অভিযাত্রীদের ঘিরে কলকাতায় আনন্দের প্লাবন
বিজয়মাল্যে বীরপুত্রদের বিরাট অভিনন্দন
টিভি কাগজে চলেছে ফটো সেশন।
এই যজ্ঞের হোতা পেম্বার প্রাণহীন দেহটা গেল হারিয়ে
হিমালয়ের কোন অজানায়, নেই তার অনুসন্ধান!

মনসংগীত ৩

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

প্রেম দেবতার আশীর্বাদে
কাটল পঁচিশ বছর,
দুঃখ-সুখের নিত্য দোলায়,
মান-অভিমান চিত্তে মিলায়,
মিলন মহোৎসবের সুরে
ভরল বিরহ প্রহর।

চাইনি কখনও, চাইব না আজ,
এসেছে হৃদয়ে রমণীয় সাজ,
কোন মহতের সতত সঙ্গে,
নিশীথে রোশনাই আলোর।

আবার যদি গো প্রেমের ভিক্ষা
মাগি তব মনদ্বারে,
জানি না কিইবা মিলিবে এবার,
সাজাবে কেমন হারে।

এ জনমে যেন দেখে যাই আমি,
রত্নগর্ভা জননী যে তুমি,
সুখীতম জায়া বিশ্বনিখিলে,
তবে প্রেম হবে অমর।

অধীনতা-একুশ-স্বাধীনতা

রঙ্গনাথ

১৪ই আগস্ট ১৯৪৭: এক অনুপম রাষ্ট্রের জন্ম হ'ল এ দিনে -
বাঙালি নিজ দেশে পরাধীন!
পূর্বের প্রদেশ পশ্চিমের অধীনে!
দুটি ভূখন্ডের মাঝে হ'ল হাজার মাইল আর অন্য এক দেশ
ভাষাতে তফাৎ; চিন্তা-সংস্কৃতি ভিন্ন; ভিন্ন সমাজ-পরিবেশ।

২১শে মার্চ ১৯৪৮: রাষ্ট্রনেতার জাতীয় ভাষার অদ্ভুত বর্ণন -
দুটির একটি হবে জাতীয় ভাষা, অন্য ভাষা রবে বর্জন;
পূর্বের জাতীয় ভাষা হবে উর্দু, তাদের নিজস্ব বাংলা নহে।
এল এক প্রতিবাদের ঝড়; ভাষার অপমানে বাঙালিরা দহে।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২, এই দিনে ছাত্র-জনতার রক্ত ঝরে;
মাতৃভাষার পুনর্বাসন চাইলে গোলাগুলি চলে তাদের 'পরে
ভাষার দাবীতে ঢাকার এক বিশাল মিছিলে হয় গুলিবর্ষণ
আহত অনেক; সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার শহীদ হন।
বাঙালিরা এ শহীদদের সম্মানে নির্মাণ করে শহীদ মিনার;
হেথায় মিছিল করে এসে নিপাত চাইবে অন্যায়-অবিচার।

ঊনসত্তরে পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধ আনে উত্তাল গণজাগরণ;
দেশে হয় নির্বাচন; সত্তরের ভোটে পূর্ব করে বিজয় অর্জন-
বাঙালিরা করেছিল দফা-দফা দাবী, পশ্চিম করে অস্বীকার
পূর্ব যেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে - শত বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার শিকার!
ভুয়া ষড়যন্ত্র মামলায় ১৫ হাজার নেতাকর্মী গিয়েছে জেলে।
পূর্বের মানুষ হয় ঐক্যবদ্ধ; তারা রাস্তায় নামে ডাক পেলে।
সারা দেশে লাঠিচার্জ, গোলাগুলি; অসাধারণ গণ অভ্যুত্থান;
আহত শত শত; শহীদ হন জহুরুল হক ও আসাদুজ্জামান।
১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ এ ডঃ সামসুদ্দোহা শাহাদত পান।
এবার ২১শের অদম্য দাবীতে ২২শে শেখ মুজিব পান মুক্তি
এই দেশ-জনতার নেতা ২৩শে পান "বঙ্গবন্ধু" স্বীকৃতি।
ভোট হবে দেশে! সবাই খুব আনন্দিত; ভোট দেয় জনগণ
সত্তরের এই গণভোটে বাঙালি সাংসদরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হন।

পূর্বের নিরঙ্কুশ জয়, সামরিক সরকার দিল না তার দাম;
অবিচার রুখতে ঘোষণা,"স্বাধীনতা চাই"।
শুরু হ'ল সংগ্রাম-

২৩শে মার্চ ১৯৭১, প্রতিরোধ দিবসের এক চরম বারতা -
নেতার ঘোষণা, কোন সমঝোতা না হলে চাই স্বাধীনতা।
সমঝোতা হ'ল না; পশ্চিম পাঠালো নব্বই হাজার সৈনিক
এল এক নিষ্ঠুর জেনারেল, সকল বিশৃঙ্খলা করতে ঠিক!
২৫শে মার্চ সারা দেশে রাতভর চলে গোলাগুলি-উৎপীড়ন
শুরু হয় ধরপাকড়, অগ্নিকাণ্ড, হত্যাকাণ্ড, উৎপাটন -
এক কোটি বাঙালি দেশ ছাড়ে প্রাণ-মান বাঁচাবে বলে।
শুরু হয় গেরিলাযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধারা ছুটে আসে দলে দলে;
গ্রামে-গঞ্জে পশ্চিমী সৈনিকরা চালায় পাশবিক নির্যাতন
দমনের নামে ধরে নিয়ে গিয়ে করে হত্যা, ইজ্জত হরণ।
বিশ্বের মানুষ দেয় ধিক্কার! থামে না ওদের পাশবিকতা।
সন্ত্রাস রুখতে মুক্তিযোদ্ধার সাথে থাকে আপামর জনতা;
মিত্রবাহিনী যোগ দেয়; দুরাত্মাদের শুরু হয় পিছু গমন;
১৬ই ডিসেম্বর পশ্চিমের সেনাবাহিনী করে আত্মসমর্পণ।

নির্ভীক বাঙালিরা থামাতে চেয়েছে সকল অন্যায় অবিচার
ঐক্যবদ্ধ থেকে সংগ্রাম করে পেয়ে গেছে ন্যায্য অধিকার।
পশ্চিমের বর্বরদের জুলুমবাজিতে সারা দেশে হয়েছে দুর্গতি
এমন স্থান বা পরিবার নেই যে যার হয়নি কোন ক্ষতি!
সারা দেশে দু লক্ষ মা-বোনের কান্না এখনো হয় ধ্বনিত
পাঁচ লক্ষ শহীদ প্রাণ দিয়ে দেশকে করেছে রক্ত-রঞ্জিত।
মিত্র বাহিনী এসে যুদ্ধ করেছে; হারিয়েছে দু হাজার প্রাণ
লক্ষাধিক মুক্তিযোদ্ধা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে রেখেছে অবদান।

একুশ ও স্বাধীনতার ইতিহাস সদা এক সূত্রে রবে গাঁথা
একুশ বাঙালিদের করেছে ঐক্যবদ্ধ; চিত্তে এনেছে দৃঢ়তা;
একুশ শিখিয়েছে দুঃসাহসী হতে, বাঁচতে সম্মানের সাথে
জুলুম এলে পিছু হটা নয়; অন্যায় দেখে রুখে দাঁড়াতে।

(ফেব্রুয়ারী, ২০১৯-এর সাহিত্য সভায় পড়া হয়)

[যারা যুদ্ধ চায় তারা নিজেরা কোনোদিন যুদ্ধক্ষেত্রে যায় না | আর যারা যুদ্ধ করতে যায় তারা আসলে যুদ্ধ চায় না | একথা তো আমাদের সকলেরই জানা | তবু পৃথিবীতে যুদ্ধ হয় | ভবিষ্যতেও হবে | কারণ এ-গ্রহের মুষ্টিমেয় মানুষের যুদ্ধটা বড় দরকার - তাদের ক্ষমতালিপ্সা, অর্থলিপ্সা আর জিঘাংসা চরিতার্থ করতে | সেই যুদ্ধবাজরা এই বিশ্বের চালক-আসনে বসে যাদের জীবন নিয়ে হেলায় ছিনিমিনি খেলে, এই কবিতাটি সেরকম একজনকে নিয়ে | সে যে কোনো যুদ্ধক্লিষ্ট দেশেরই একজন নাগরিক হতে পারত, কিন্তু ধরা যাক সে জন্মেছে আমাদেরই মাতৃভূমিতে | সে বেছে নিয়েছে সৈনিকের জীবন, আর নিজের অজান্তেই কখন হয়ে গেছে যুদ্ধবাজদের দাবার বোড়ে | তারই এই খোলা চিঠি এক সহপাঠীকে -]

আমরা দুজন

সুজয় দত্ত

আঠেরো বছরে ঘর ছাড়ি দুজনেই |
তুই পা বাড়ালি আই আই টির দিকে -
বনতে এঞ্জিনিয়ার |
আমি ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে -
দেখা হবে বল কি আর?

তোর দিন কাটে আটটা-পাঁচটা ঠান্ডা ক্লাসের ঘরে |
আমি পড়ে থাকি ট্রেনিং-এর মাঠে, ক্লান্তিতে দেহ ভরে |
রাত্রিতে তুই আরামে নিদ্রালোকে |
তীক্ষ্ণ সজাগ প্রহরা আমার চোখে |
পড়াশোনা শেষে তোর হাসিমুখে ডিগ্রী নেবার কালে
আমি পা ফেলেছি পাসিং আউট প্যারেডের তালে তালে |

আই-টি দুনিয়া টেনে নিল তোকে টাকা-গ্ল্যামারের টানে |
আমার দু-কাঁধে দুটো তারা গেঁথে ডেকে নিল পল্টনে |
অফিসের শেষে বাড়ি ফিরে তুই বাবা-মাকে পাস নিত্যদিন |
আমি শুধু রোজ আশা করে থাকি কবে দেখা পাব এক-দুদিন |
উৎসবে আর পার্বণে তোর ঝলমল করে আলো |
আমি শুয়ে থাকি একা বাঙ্কারে জড়িয়ে আঁধার কালো |

সব জীবনেই দু-এক ঝলক সুখের প্রহর আসে |
বিবাহসূত্রে বাঁধা পড়লাম দুজনেই একই মাসে |
প্রিয়া পাশে নিয়ে শয্যায় তুই, দুচোখে স্বপ্ন ঘেরে |
আমার প্রিয়ার করজোড়ে কাটে - 'প্রাণ নিয়ে যেন ফেরে' |
তুই পাড়ি দিলি সুদূর বিলেতে উচ্চশিক্ষা নিতে |
আমি ছুটলাম সীমান্তপানে, শত্রু পাহারা দিতে |

দিন কেটে যায়, মাস কেটে যায়, সময়ের স্রোত ধরে
একদিন ফিরে সত্যি এলাম দুজনেই নিজ-ঘরে |
দুই হাতে তুই আদরে মোছালি প্রিয়ার চোখের জল |
আমি তা পারিনি, কফিন আমার বইছিল সেনাদল |
পতাকায় মোড়া সেই শবাধারে শায়িত আমার শব -
যা ছিল আমার সবই তো দিলাম,
ভালো থেকো দেশ, ভালো থাক তোরা সব |

তন্দ্রা মাঝে

শঙ্কর তালুকদার

সুন্দর শান্ত করুণ কান্ত
উদাসিনী বেশে
সন্ধ্যার ন্যায়
তুমি এলে।

এলে যদি
নীরবে নিশীথে
দ্বিধা কেন
প্রাঙ্গণে দাঁড়াও একাকিনী।

দিবসের জ্বালা যত
হোক তা গত
নতুন উৎসবের সুরে
মালা হোক গাঁথা।

খুলে দাও কেশরাশি
আঁধারের বুকে হাসি
মর্মের লজ্জা যত
দাও খুলে ফেলে।

উষ্ণ চাহনি দেখে
আকুলতা যদি কাঁদে
বক্ষে লয়ে তারে
দিও গো সম্মান।

জগতের পারাপারে
বসেছিনু সব ভুলে
অশ্রুহীন শান্ত চিতে
আলয়ে আমার।

তন্দ্রামাঝে কোন আশে
দেখিনু তোমায়
বসে আছ বিছানায়
কুন্তলে ঢাকা আধো-চাঁদ।

ভূতের গল্প

পার্থ সরকার

ব্রহ্মদত্যি হুঙ্কার তুলে বেলগাছেতে বসে,
পেত্নী facial করে কেমন খিলখিলিয়ে হাসে।

ভূতটা কেমন লম্ফ মারে ডিস্কো গানের তালে,
শাঁকচুন্নির বড়ই দেমাক, থাকেন এলোচুলে।

রাক্ষস আর খোক্কসেতে দেখো কেমন দোস্তি,
দুজন মিলে প্ল্যান করেছে করবে অনেক মস্তি।

গা-ছমছম অন্ধকারে নাইবা আজ গেলে,
তেনাদের আজ নাচতে দাও, গানের ছন্দে-তালে।

সাবধান, আজ ভূত-চতুর্দশী;
যেয়োনাকো বাইরে ধরবে এসে নিশি!

কবিতা

নমিতা রায়চৌধুরী

নিয়ম ভেঙে ভালবাসছ তুমি আজ,
কথার সুরে জড়িয়ে ধরে বলছ -
আমি এক আলো |
তোমার পরিপাটি জানালার আকাশ-
সেও আজ বলল ডেকে -
'তুমি উজ্জ্বল এক তারা'|

কেন যে আজ বলছ এত করে,
'নদী আর একটিবার ঝর্ণা হয়ে দেখো'!
তোমার সুরের তালে,
আকাশও গাইছে আজ গান |
সন্ধ্যাকাশে মিলিয়ে যেতে যেতে,
ওই দূরের পাখিটি -
সেও যে আজ বলল ডেকে, তোমারি মতো -
'পা ভিজিয়ো সাগরজলে'...

পারি বুঝি?
আমিও যে ওদেরই মতো,
রোজ খেটে খাই, ওদেরই একজন |
রোদে পোড়া গায়ের রঙ, কালচে চোখের কোল,
আর হাতগুলো, দেখো ছুঁয়ে, যেন পাথর!
শুধু কেবল ইঁটের ভাটায় ইঁট পোড়ানোর সময়
মনটাও পোড়াই তোমার প্রেমে রোজ |

এতই যদি ভালবাস কবি,
দাও না একটি কবিতা আমায় -
যার বিনিময়ে কিনব আমি ঐশ্বর্য,
স্বস্তির সুখ, আর এমন একটি আঁচল -
যেখানে থাকবে না অভাবের একবিন্দু অশ্রুজল |
খুঁজে পাব সেই অন্নপূর্ণা চাল
যার কোনও অন্ত নেই -
থাকবে না আমার একটি শিশুও অভুক্ত।
অকাল বিধবা পিসিমার হাঁপানি রোগ
সেরে যাবে তোমার কবিতায় |

পাশের বাড়ির বকুল -
মরবে না আর বিনা চিকিৎসায় |
আর ঐ শেফালি -
দলাপাকানো মাংসপিন্ডের মতো
যার মৃতদেহ পড়েছিল ব্রীজের তলায় -
সে হবে এমন এক জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড,
যার লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হবে
নৃশংসতার হাত, মুখ,বুক,চোখ,
সর্বোপরি সারা অঙ্গ |
পরিশুদ্ধিকরণে সেই আগুনে
ঝাঁপ দেবে সকল অমানবিকতা |

পারবে এমনি ভালবাসতে আমায়?
দিতে পারো এমন একটি কবিতা
কেবল একটিই কবিতা!

আগে মানুষ তারপর অন্য কিছু

বলাকা ঘোষাল

দেশ থেকে এসে প্রায় সবাই কাত হয়ে পড়ি|

কি, পড়ি কিনা? হ্যাঁ, তা বটে| অনেকে তো প্লেনে উঠেই কাত| বা এয়ারপোর্টেই অজ্ঞান | যারা কোনরকমে মার্কিনভূমিতে পা ঠেকাল তারা বাড়ি এসেই চিৎপাত|

এই প্রথম আমি উড়োজাহাজে উঠেই টের পেলাম যে আমার শরীর নামক যন্ত্রটি বিকল হ'ল বলে| ষোল ঘন্টার সফর বুঝি আর কাটবে না| কিন্তু ভাল খবর হ'ল - সব বিপদেরই একটা মঙ্গলময় দিক আছে সেটা বৃষ্টি-শেষের রামধনুর মতন পরেই টের পাওয়া যায়| আজ সেই রামধনুর কথাই বলতে আসা|

দুবাই থেকে প্লেন তখন ছাড়বে ছাড়বে করছে| আমার পাশেই একজন আমেরিকাবাসী পাকিস্তানী মহিলা বসেছিলেন | বেশ আলাপী | তারা চার বোন মিলে মক্কা-মদিনা ঘুরে এলেন | অনেক গল্প হ'ল| এদিকে যে আমাদের দুই দেশ তখন যুদ্ধ প্রায় বাধিয়ে বসেছে! তাই শুধু নয়, সোশাল মিডিয়ায় আমাদের চেনাজানাদের মধ্যে দেখলাম তিন জেনারেশনই পাকিস্তানকে তুমুল কথার বানে ফালা ফালা করে ফেলেছে | আমার অনুমান পাকিস্তানেও তারা হোয়াটসঅ্যাপে ভারতকে ছেড়ে কথা কইছে না| অথচ আমাদের বাক্যালাপে তার আঁচ নেই, এই রক্ষে|

প্লেন যখন রানওয়ে ধরে ছুটে চলেছে আমার হঠাৎ মনে হ'ল ফুসফুসের উপর যেন কেউ শিলনোড়া রেখে দিয়েছে| দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে | প্লেন মধ্য গগনে ওঠার আগেই বুঝলাম এই ষোল ঘন্টা কাটানো যাবে না কিছুতেই| সীটবেল্ট সঙ্কেত তখনও জ্বলছে | এয়ার হোস্টেসরা বসে আছে যে যার জায়গায় | পার্থ ছুটল আমার জন্য গরম জল আনতে | ওরা তো সবাই হাঁই হাঁই করে উঠেছে – এখন আবার কেউ সীট ছেড়ে ওঠে নাকি!

কিন্তু যেই তারা বুঝেছে যে কারুর নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে অমনি তৎপর হয়ে উঠল | তার পরের কয়েক ঘন্টা খুব প্রাণকাড়া | প্রাণকাড়া অর্থাৎ প্রাণ নিয়ে কাড়াকাড়ি | আর কিছু এমন সুখানুভূতি যার জন্য প্রাণও হয়তো দেওয়া যায়|

গ্রাউন্ডের ডাক্তাররা তো মিনিট পনেরো পরে পরেই খোঁজ নিচ্ছেন, প্লেন কোথাও নামাবে কিনা তার আলোচনাও চলেছে, সেটা টের পেয়েছি পরে|

চলে এল এক সুটকেসভর্তি মেসিনপত্র | মনিটর লেগে গেল প্রেশার, পালস্, রক্তের অক্সিজেন লেভেল মাপার জন্য | আমার শিরা যে লাফাচ্ছে সে বলা বাহুল্য – পালস্ ১৪০-এ গিয়ে যখন ঠেকল, আমার হৃদপিণ্ড তখন যেন হাতের মুঠোয়|

হঠাৎ আমাকে ঘিরে থাকা অ্যাটেন্ডেন্টদের চোখে মুখে টের পেলাম একটু টেনশান, আমার নাকি অক্সিজেন লেভেল কমে যাচ্ছে | সে আর বলতে? সে তো আমি কোনও মেসিন ছাড়াই বলে দিতে পারতাম | ব্যস্, এসে গেল ফুট দুয়েকের অক্সিজেন সিলিন্ডার|

ভাবলাম বাহ্, এটাই বাকি ছিল জীবনে | তাও আবার মধ্য আকাশে | চারিদিকে আকাশ বাতাশ আমাদের যানের বাইরে, এদিকে তারই মাঝখানে আমার ওই আকাশ-বাতাস-হীন অবস্থায় জান যায় যায় আরকি|

হঠাৎ অ্যানাউন্সমেন্ট হ'ল প্লেনে ডাক্তার কেউ আছেন কিনা | উঠে এলেন দুজন | একজন আমারই পাসের সীটের ভদ্রমহিলার দিদি, টেক্সাস চিলড্রেনস হাসপাতালের পিডিয়াট্রিশিয়ান | আর অন্যজন কর্পাস ক্রিস্টির নেফ্রলজিস্ট | দুজনেই পাকিস্তানী | পিডিয়াট্রিশিয়ান ভদ্রমহিলা ঠায় ঘন্টা দুয়েক আমার পাশে দাঁড়িয়ে এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে পরামর্শ করে চললেন কোন ওষুধ আমাকে দেওয়া প্রয়োজন | প্লেনে যিনি সবার হেড, খুররম খান – তিনিও মাঝে মাঝে এসে দেখে যাচ্ছেন | কেউ কেউ তাদের ব্রেক টাইম বা খাওয়ার টাইমও অগ্রাহ্য করে আমাকে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে|

তাদের মধ্যে জামেইন হ'ল ইজিপ্টের মেয়ে, সপ্রতিভ, বুদ্ধিমতী, মেডিক্যাল ট্রেনিং ভালই আছে| অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সেবা করে চলল | আমাকে প্রশ্ন করলে উত্তর পেতে বেশ সময় লাগে | সব হেঁপো রুগীরই সেই দশা | আগে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে, তারপর আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম ওরা খেয়েছে কিনা, আহমেদ, ওদের মধ্যে একজন, হেসে বলল - কোনও চিন্তা করবেন না, একদিন একটু দেরীতে খেলে কিছু ক্ষতি হবে না | একটা স্যান্ডউইচ খেয়ে নিয়েছি, তাতেই চলবে| আহমেদের মা কেরালার মেয়ে, ডাক্তার| বাবা ইরানী | বড় হয়েছে দুবাইয়ে আর পর্তুগালে | বাচ্চা ছেলে আহমেদ প্যারামেডিক হিসেবে কাজ করেছে আগে | এখন ও ফ্লাইটে মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স দেওয়ার ট্রেনিং নিচ্ছে| আমাকে নিয়ে হাতে কলমে একটু অভিজ্ঞতাও বেড়ে গেল ওর|

জার্মেইনের এদিকে একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। তখন আরেকটি স্টুয়ার্ড তার জায়গায় এল। সে বেশি কিছু না জানলেও তার নম্র, ভদ্র ব্যক্তিত্ব দিয়েই যেন অনেকটা সাহায্য করল। দুবাই-এর ছেলে আলেহান্দ্রো। সত্যি, আমাকে যে কত দেশের, কত ভাষাভাষীর মানুষ সাহায্য করে চলেছে তখন, সেই ভেবেই আমার ভারি ভাল লাগছে।

আমাকে ইতিমধ্যে ওরা আইলের মাঝখানের সীটের বদ্ধ জায়গা থেকে বার করে নিয়ে এসে বসালো এয়ার হোস্টেসদের টেক-অফ্, ল্যান্ডিং-এর ফ্লিপ সীটে। পার্থ পুরোটা সময় আমার সাথে। ওরও খাওয়া হ'ল কিনা খেয়াল নেই। উদ্বেগে খাওয়া তখন সত্যিই মাথায়।

টান উঠলে খাওয়ার প্রশ্নই আসে না। বড়জোড় গরম জল। আহমেদ কিছুক্ষণ পরে পরেই না চাইতেই আমার জন্য মধু আর কয়েক ফোঁটা লেবু দিয়ে একটা উপাদেয় ড্রিংক নিয়ে আসছে। নিঃশ্বাসের জন্য যখন লড়াই চলে তখন হালকা গরম জলই এলিক্সার মনে হয়ে। আর এই যাদু ড্রিংকটি তখন স্বর্গের মদিরা মনে হচ্ছে।

ঘন্টা দুয়েক ধরে অক্সিজেন চলল। এদিকে ওই ফ্লিপ সীটে হাতল নেই; আমার হাত পা তখন একেবারেই ল্যাগব্যাগ সেপাই-এর মতন, চারিদিকে ঝুলছে। হাল দেখে বোঝা যাচ্ছে যে কমবার কোনও লক্ষণ নেই। অতএব স্টেরয়েড শট লাগবেই।

খটাখট স্যুটকেস খুলল জার্মেইন। বেরোল অ্যাম্পল, সাথে সেই পুরনো প্রথায় কাঁচ কাটার ছুরি। পিডিয়াট্রিশিয়ান তেহসীন বললেন যে তিনি যেহেতু বাচ্চাদের স্টেরয়েডের মাত্রা ঠিক করে থাকেন, অন্য ডাক্তারটি মাপ মতন ওষুধ নিয়ে ইঞ্জেকশনটি দিলে ভাল হয়। তাই হ'ল। নেফ্রলজিস্ট ডাক্তার করিম-ই শট দিলেন। স্টেরয়েডের নাগাল পেয়েই ফুসফুসটি দস্তুর মতন চাঙ্গা হয়ে উঠল। ততক্ষণে গায়ে পিঠে ব্যথা হয়ে গেছে। ভাল খবর হ'ল ফুসফুসের বদান্যতায় এবার একটু শোয়া যাবে। আমার পাশের মহিলাটিকে অন্য সীটে স্থানান্তরিত করে, আমাকে অনেক ভাল ভাল বালিশ এনে দিল ওরা। এত ভাল বালিশ যে বলবার নয়। আমাদের সেই চিরাচরিত ইকনমি ক্লাসের ফুলকো এক কুচি নয়। মনে হ'ল বিজনেস ক্লাস বা ফার্স্ট ক্লাসের থেকে আমদানি হয়েছে। মোটমাট ফাইভ-স্টার কায়দায় কাত হয়েই ঘুম এল অকাতরে। এমনি দেখে শুয়ে আছি মনে না হলেও হাঁপানী রুগীর ওটাই 'শয়নে পদ্মলাভ'। হিউস্টন পৌঁছাতে তখনও বহু ঘন্টা বাকি। জার্মেইন, আহমেদ, আর ডাক্তার তেহসীন মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে কেমন আছি। তাদের ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা আমার নেই, তাও বললাম। আর আহমেদের তৈরী চায়ের গুণগান না করেও পারলাম না। আহমেদ মুচকি হেসে বলল, 'ওটা হল আহমেদ-স্পেশাল।' সত্যিই তাই।

'তোমরা কত কিছু করলে আমার জন্য,' বলামাত্র আহমেদ বলে বসল, 'আপনি তো আমার মায়ের মতো, করব না?' আমার মুখে তখন সাজানো কথা যা কিছু ছিল সব উধাও হয়ে গেল। সেবা করার এই মনোভাব নিয়ে ও বহু লোকের জীবন ছোঁবে - সেটা ভেবেই ভাল লাগছিল।

হিউস্টন যখন ছুঁই ছুঁই, জার্মেইন এল মেডিক্যাল কাগজপত্র বোঝাতে আর ফর্ম ভরতে। সারাক্ষণ যে একটু ভয় হচ্ছিল না তা নয়। মধ্যগগনে এহেন এমার্জেন্সী সার্ভিসের নিশ্চয়ই ৯১১-এর তুলনীয় বিল হবে। জিজ্ঞেসই করে বসলাম, 'মাশুল কত?' শুনেই বলল এসব বিনামূল্যে, টিকিটেরই অংশ। আমরা তো হতবাক!

'একটা টাকাও লাগবে না, ইটস্ পার্ট অফ আওয়ার সার্ভিস।' বলে জার্মেইন যখন হাসল, অভিভূত না হয়ে পারলাম না। প্লেনের টিকিটের চড়া দাম নিয়ে কার না অভিযোগ নেই? সেদিন এমিরেটসের ব্যবস্থাপনা দেখে বুঝলাম যে এদের শুধু যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছনো ছাড়াও অনেক প্রস্তুতিপর্ব রয়েছে। এই এবার আমার টিকিটের দাম পুরোদস্তুর উসুল হ'ল।

যক্ষের কাছে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন আরোগ্য লাভই শ্রেষ্ঠ লাভ। সেটা আবার নতুন করে মালুম হ'ল। আরও ভাল লাগল যে আমরা এককালে এক-দেশের বাসিন্দা হয়েও যে প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে লড়ে চলেছি তারাও আমাদেরই মতন মানুষ। আর দুই দেশেই কিছু ভদ্র শান্ত হৃদয়ের মানুষ এখনও রয়েছে যারা আগে মানুষ, তারপর জাতি, ধর্ম বিশেষে হয়তো বা অন্য কিছুও।

এই কয়েক ঘন্টার সফরে কত দেশের মানুষ, যাদের বেশিরভাগই মুসলমান, আমার যত্ন শুশ্রূষা করলেন। ভেদাভেদের সব দেওয়াল তখন খসে গিয়েছিল। আর ল্যান্ডিং-এর কয়েক মিনিট আগেও হাতে এসেছিল মন মাতানো 'আহমেদ-স্পেশাল হানি-লেমন টী'।

বড়মা

কৃষ্ণা গুহ রায়

প্রায় আশি ঊর্ধ্ব বয়সের ননীবালা এখন চোখে ঠিক মতন দেখতে পান না | বয়সের ভার এখন তার সর্বত্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে | স্মৃতি-সমুদ্রের বালুকাবেলা এখন সোনালী রঙের পরিবর্তে ধূসর রঙ ধারণ করেছে | সেই কোন ছেলেবেলায় এই বাড়িতে বউ হয়ে এসেছিলেন আজ তা মনেও করতে পারেন না| অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন ননীবালা | তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন মল্লিক বাড়ির বড়কর্তা | পুত্রবধূ করবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন ননীবালার বাবার কাছে | গরিব বাবার কাছে এ যেন আকাশের চাঁদ পাওয়া | শুধু শর্ত ছিল কখনও বাপের বাড়ি যেতে পারবে না ননীবালা, তাহলে মল্লিক বাড়ির সম্মান ক্ষুণ্ন হবে | বুক ফেটে গিয়েছিল বাবা মায়ের | তবু মেয়ের সুখের কথা ভেবে বাবা মা দুজনেই রাজী হয়েছিলেন | সেই বারো বছর বয়সে বাবা-মা'র কোলছাড়া হয়ে পাকাপাকিভাবে মল্লিক বাড়িতে চলে এসেছিলেন ননীবালা | তারপর কত বছর কেটে গেছে, তবু সেই ফেলে আসা বাপের বাড়ির উঠোন, নদীর ধার, আমবাগান সব যেন এখনও চোখের সামনে দেখতে পান ননীবালা | মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে সেখানে যেতে, কিন্তু কেউ নেই সেখানে, যারা আছে কেই বা চিনবে তাকে | সমস্ত সম্পর্কের বাঁধনটাই তো কবে ছিঁড়ে গেছে | এখন আর তাকে নতুন করে জোড়া যায় না |

ঘরের বারান্দায় বসেছিলেন ননীবালা | হঠাৎ কারো ডাকে মুখ ফেরালেন | শিবানী এসেছে | শিবানী এ বাড়ির সরকারবাবুর মেয়ে | পনেরো পেরিয়ে ষোলয় পা দিয়েছে | ওরাই এখন ননীবালার একমাত্র ভরসা | নয়তো এতবড় বাড়ি, রাধাগোবিন্দের মন্দিরের দেখাশুনা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল | ননীবালা জানেন তিনি চলে গেলে এখানে কিছুই থাকবে না | তবুও বটগাছের ঝুরির মতন এখনও স্বামী-শ্বশুরের ভিটে আঁকড়ে রেখেছেন | এ বাড়ির প্রতিটি ইঁট পাথরের মধ্যেই তিনি যেন নিজেকে খুঁজে পান | অথচ এমন তো হওয়ার কথা ছিল না | তাঁর গোটা জীবনটাই তো বঞ্চনার ইতিহাস | যখন চুপ করে বসে থাকেন, সব ছবির মতন মনে পড়ে যায় | চোখ বুজলে মনে হয় এই তো সেদিনের কথা | বিয়ের পর কোথা দিয়ে কয়েকটা বছর কেটে গেল জানতেই পারেননি | স্বামীর সোহাগ, শরীরের উত্তাপের পর নারীত্বের প্রথম অনুভূতি | পুরনো দাসী বলেছিল, এবার তুমি মা হবে |

রাত্রিবেলায় ননীবালাকে শরীরের বাঁধনে বেঁধে ফেলে স্বামী সূর্যকান্ত বলেছিল, আমি সন্তান চাই | মল্লিক বাড়ির উত্তরাধিকারী | অস্ফুটে ননীবালা জবাব দিয়েছিলেন, আমিও মা হতে চাই | দুর্ভাগ্য ননীবালার, তিন বছরেও ননীবালার কোল আলো করে কেউ এল না | মানসিক এক যন্ত্রণার মধ্যে অনুভব করতে পারছিলেন একটু একটু করে শুধু স্বামী নয় সংসারের সবার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন তিনি | তবুও হয়তো তা মেনে নিতে পারতেন, কিন্তু যেদিন শুনলেন মল্লিক বাড়িতে নতুন বৌ আসছে সেদিন স্বামীর পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন, আমার এ সংসারে নতুন কাউকে নিয়ে এসো না | সূর্যকান্ত গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, কিসের সংসার? মল্লিক বাড়ির বড়বৌ হয়ে তুমি সন্তান ধারণে অক্ষম | এ সংসারে তোমার কোনও অধিকার নেই | অল্পদিন পরেই মল্লিক বাড়িতে সানাই বেজে উঠল | নতুন বৌ ঘরে আসবার আগেই ননীবালা নিজের স্থান করে নিয়েছিল নাটমন্দিরে রাধামাধবের ঘরের পাশেই ছোট্ট একটা ঘরে | রাধামাধবের সেবাতেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন | সূর্যকান্তর নতুন সংসারের টুকরো টুকরো খবর কানে আসত | মাস যায়, বছর পেরিয়ে যায়, নতুন কোনও মানুষের আগমন ধ্বনি কানে ভেসে আসে না |

একদিন শেষরাতে খবর আসে সূর্যকান্তর নতুন বৌ কালোদীঘির কালোজলে আত্মহত্যা করেছে | তারপরে সূর্যকান্তর গোটা জীবনটাই যেন পাল্টে গেল | একজন সুস্থ সবল মানুষ পরিণত হ'ল মাতাল, লম্পট, অত্যাচারী মানুষে | কয়েকটা বছর কেটে গেল | স্বামীর কোনও সংবাদ রাখেননি ননীবালা | মনেপ্রাণে ভুলতে চেয়েছিলেন মানুষটাকে | কিন্তু যেদিন শুনতে পেলেন রোগশয্যা থেকে তাকে দেখতে চেয়েছেন মানুষটা সেদিন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি ননীবালা | মনে হয়েছিল রাধামাধবের সেবার চেয়ে স্বামীর সেবাই এখন তার কাছে বড় সেবা | মৃত্যুর আগে ননীবালার হাতদুটো ধরে সূর্যকান্ত বলেছিলেন, তোমার কোনও দোষ নেই, আমিই সন্তান ধারণে অক্ষম, সব অপরাধ আমার | ননীবালার মনে হয়েছিল এতদিনে যেন তিনি শাপমুক্ত হয়েছেন |

তারপর কত বছর কেটে গেছে | মল্লিক বাড়ির সূর্য অস্ত

গেছে | রাধামাধবের সেবাতেই জীবনের ষাটটা বছর কাটিয়ে দিয়েছেন ননীবালা|

সূর্যকান্তর ছোটভাই চন্দ্রকান্তও মারা গেছেন | বহু আগেই তাঁরা এখানকার বাস উঠিয়ে নিয়ে কলকাতায় চলে গেছেন | নাতিনাতনিরা মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে | সারাদিন হৈচৈ করে, মাছ ধরে, ফল পেড়ে সন্ধ্যেবেলায় ফিরে যায় | ননীবালার কাছে কেউ আসে না | ননীবালা তাদের কাছে অন্য এক গ্রহের মানুষ|

একদিন ঘর থেকেই তাঁর চোখে পড়ে বড়নাতি দেবাংশুর সাথে আরো কয়েকজন নাটমন্দিরের চারিদিকের জমির মাপজোপ করছে| রাতের বেলায় সরকারমশাইকে ডেকে পাঠালেন ননীবালা। শেষ বয়সে এই মানুষটাকেই আঁকড়ে বেঁচে আছেন তিনি| সরকারমশাইও এই বাড়ির মায়া কাটিয়ে কোথাও যেতে পারেননি| ওরা কী করছে সরকারমশাই? জিজ্ঞেস করেন ননীবালা | কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নিচু করে বলেন সরকারমশাই, আপনার নাতিরা এখানে নাটমন্দির ভেঙে ফেলে হোটেল বানাবে|

চমকে উঠলেন ননীবালা | তার সাধের নাটমন্দির ভেঙে ফেলা হবে! রাধামাধব তো তাঁর কাছে শুধু এক অষ্টধাতুর মূর্তি নয়; তার চেয়েও অনেক বড় | সেই রাধামাধবের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন! গোটা রাত ঘুমোতে পারেন না ননীবালা | ভোরবেলাতেই ডাক দেন সরকারমশাইকে - আপনার সাথে একজায়গায় যাব | বিকেলবেলায় দুজনে ফিরে আসেন | সারাদিনের পরিশ্রম, মনের উত্তেজনায় পরদিনই বিছানা নিলেন ননীবালা | গোটা রাত মাথার পাশে জেগে থাকেন সরকারমশাই আর শিবানী | শেষরাতে একবার চোখ মেলে তাকালেন ননীবালা | অস্ফুটে বললেন, আমার রাধামাধব রইল সরকারমশাই, আপনি দেখবেন| তারপরই চোখ বুজলেন ননীবালা|

মল্লিক বাড়ির বড়বৌ মারা গেছেন | ধুমধাম করে শেষকাজ করে নাতিরা | দুহাতে খরচ করে দেবাংশু | এত বড় সম্পত্তি সব ছিল ননীবালার নামে! মৃত্যুর আগে সূর্যকান্ত সব ননীবালাকে দান করে গিয়েছিলেন | দেবাংশু জানে ননীবালার অবর্তমানে এখন সে নিজে সবকিছুর মালিক | ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে দেবাংশু | বড় হোটেল উঠবে এখানে, কত মানুষ আসবে, মদের ফোয়ারা ছুটবে|

মিস্তিরিরা আসে শাবল, কোদাল, গাঁইতি হাতে | নাটমন্দির ভাঙা হবে | সামনে এসে দাঁড়ান সরকারমশাই | দেবাংশু এগিয়ে আসে, কি হয়েছে? সরকারমশাই একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন দেবাংশুর দিকে | দেবাংশু চিঠিটা হাতে নিল | উকিলের চিঠি | ননীবালাদেবী তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে গেছেন|

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দেবাংশু | তারপরে অস্ফুটে বলে, বুড়ির মনে এই ছিল!

হিরণ্ময়ী কৃষ্ণকলি

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

আমি হিরণ্ময়ীকে জিজ্ঞেস করলাম আমাকে বিয়ে করতে সে রাজি আছে কিনা | হিরণ্ময়ী ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেল; মুখে না বললেও আমি আন্দাজ করতে পারলাম | এটা বুঝতে পারছি আমাকে বলতে না পারলেও আমাকে বিয়ে করতে ওর ইচ্ছে নেই | কিন্তু সেটা বলতে চাইছে না | ভাবছে আমি যদি রাগ করে সম্পর্ক না রাখি | কেন আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে না সেটাও আমি জানি |ওকে প্রায়ই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে দেখি জগন্নাথের সাথে | জগন্নাথ একটা কুচকুচে কালো রঙের চকচকে লম্বা গাড়ি চেপে হিরণ্ময়ীকে নিয়ে বাইপাসের ধারে দামি রেস্তোরাঁয় ডিনার করে আর হুইস্কি খায় | আমি হুইস্কি খাই না বলে হিরণ্ময়ী আমাকে পছন্দ করে | কিন্তু আমার তেমন রোজগার নেই বলে আমাকে নিয়ে কোথাও খেতে গেলে হিরণ্ময়ীই খাবারের দাম মেটায় | ওর খুব সুন্দর সাদা চামড়ার একটা ভ্যানিটি ব্যাগ আছে | ভেতরে একটা হরিণের চামড়ার পার্স রাখা থাকে | তার মধ্যে কারেন্সি নোটগুলো পরিপাটি করে সাজানো | হিরণ্ময়ী এক একটা নোট টিপে টিপে বের করে |

কিছুদিন যাবৎ হিরণ্ময়ীকে বিয়ে করার ইচ্ছেটা আমার প্রবল হয়েছে | কারণ হিরণ্ময়ী খুব সুন্দর সেন্ট মাখে আর সরু সরু হীরে মুক্তোর গয়না পরে | একরঙা জর্জেট শাড়িতে ওকে দারুণ মানায় |

কৃষ্ণকলি পড়াশুনোয় ভীষণ ভাল, কিন্তু খুব লম্বা চওড়া | আমার থেকে লম্বায় দু'আঙুল বেশী | গায়ে আসুরিক শক্তি, ক্যারাটে জানে | জিমে যায় | আমার মা'র আবার এইরকম মেয়েই পছন্দ | আমি একটু থলথলে ভসকা কাত্তিক | কোনদিন মারামারি হলে কৃষ্ণকলির হাতে মার খেয়ে মরেই যাব | একবার কি একটা গণ্ডগোলে বাস স্ট্যান্ডের বিশা মস্তানকে কৃষ্ণকলি এমন বেধড়ক ঠেঙিয়েছিল যে দিন সাতেক পরে কোন গতিকে সারা গায়ে স্টিচ, প্লাস্টার নিয়ে নার্সিংহোম থেকে বিশা বাড়ি ফেরে |

এই অবস্থায় আমার কী করা উচিৎ ভেবে না পেয়ে জগন্নাথকেই সব কথা খুলে বললাম | জগন্নাথের মাথায় অনেক বুদ্ধি | নানা ধরনের ব্যবসা করে | আটা চাকি, ওষুধের দোকান, প্রমোটারি, জমির দালালি, পেট্রল পাম্প, গ্যাসের ডিলারশিপ, এন জি ও - নানা ব্যবসা | আগে গায়ের রঙ কুচকুচে কালো ছিল | এখন মেদ জমে চামড়া টান টান হয়ে ফরসা হয়ে গেছে | সব সময় সাদা জুতো সাদা প্যান্ট আর কালো টি-শার্ট পরে থাকে | গলায় মোটা সোনার চেন তাতে আবার সাউথ ইন্ডিয়ান গুরুমা'র ছবি ঝোলে | মোটা জুলফি থুতনি পর্যন্ত | কিন্তু ওই পর্যন্তই | এমনিতে ভীষণ সাদামাটা ছেলে | পরোপকারীও বটে |

আমাকে খোলাখুলি বলল, 'কী করব মাইরি! একদম সেঁটে গেছে | নামাতে পারছি না |'

আমার একটু খারাপ লাগল | আমার সাধের হিরণ্ময়ীকে জগন্নাথ ঘাড় থেকে নামাতে চাইছে, এ তো একরকম আমারই রুচি বা পছন্দকে বিদ্রূপ করা |

জগন্নাথ আরও বলল, 'দেখ শ্যামাকান্ত, তুই আমাকে ভুল বুঝিস না | আমার কিন্তু এত ফ্যাশনেবল মেয়েছেলে ঠিক চলবে না | একটু ডাকাবুকো মর্দানা হলে ভাল হয় | শালা আমাদের লাইনে তো শত্রুর অভাব নেই | হিরণ্ময়ী-ফয়ী আমার চলবে না | তুই একবার বল, আমি লাইন ছেড়ে দিচ্ছি | মালটাকে নিয়ে তুই ঘোরাঘুরি কর | আমার গাড়িটা দিয়ে দেব | সপ্তাহে দুদিন করে এসে বাইপাসের রেস্তোরাঁতে খাবি | আমি মাসের শেষে বিল মিটিয়ে দেব | মোটমাট আমার পিছু ছাড়ার ব্যবস্থা কর | বরং কৃষ্ণকলির সঙ্গে আমার একটা লাইন করিয়ে দে |'

সব শুনে আমার একটা মিক্সড ফিলিং হ'ল | যেমন অনেকটা স্বস্তি পেলাম, ঠিক তেমনি হিরণ্ময়ীর সম্বন্ধে জগন্নাথের ধারণাটাও আমাকে আহত করল | হিরণ্ময়ী আমাকে চাক বা না চাক বন্ধু তো বটে | আর কিছুটা হলেও পছন্দ তো করে | তাকে মেয়েছেলে আর মাল বলা আমার ঠিক ভাল লাগল না | কিন্তু কী বলব! ঠেকের ভাষা | বহু শিক্ষিত লোকই এভাবে কথা বলে, জগার আর দোষ কী? তবু মুখে লাগাম দেওয়াটা শেখাতে হবে | এখন নয়, সময়মতো |

জগন্নাথকে বললাম যে আমাদের পছন্দের গোটা ব্যাপারটা হিরণ্ময়ী আর কৃষ্ণকলিকে বোঝাতে হবে | কৃষ্ণকলিকে জগন্নাথ সম্পর্কে উৎসাহিত করে তুলতে হবে | কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে বিষয়টা না বোঝাতে পারলে চেষ্টা বৃথা | কৃষ্ণকলি পড়াশুনোয় ভাল; অঙ্কে লেটার-টেটার নিয়ে পাশ করেছিল | আমি আবার অঙ্কে কাঁচা | কিন্তু গোঁজামিলে ওস্তাদ | বেশিরভাগ অঙ্কেরই উত্তর কোনভাবে জেনে নিতাম আগে থেকে | তারপর পরীক্ষার

হলে বসে এমন ফর্মুলা আর ডিডাকশন বের করে উত্তর মিলিয়ে দিতাম যে বেশিরভাগ সময় পরীক্ষক ধরতে না পেরে বেনিফিট অফ ডাউটে কিছু নম্বর দিয়ে বসত, আর তার ফলে খুব ভাল নম্বর না পেলেও আমি কোনদিন পরীক্ষায় ফেল করতাম না।

সেদিন অনেক রাত জেগে এমন কতগুলো ইকোয়েশনের সুরাহা করলাম যার মোদ্দা নির্যাস হ'ল যে আমি এবং আমার মা উভয়েই চাইছি কৃষ্ণকলি জগন্নাথের সঙ্গে কালো গাড়ি চেপে বাইপাসের রেস্তোরাঁতে যাক এবং ডিনার করুক।

ইকুয়েশনটা এইরকম -

আমি = sh

আমার ইচ্ছে = sw

হিরণ্ময়ী = hr

জগন্নাথ = jg

কালো গাড়ি = bc

রেস্তোরাঁ = rstnt

আমার মার ইচ্ছে = mw

কৃষ্ণকলি = kr

এদিকে -

আমি+আমার ইচ্ছে = হিরণ্ময়ী

আবার -

হিরণ্ময়ী = জগন্নাথ+কালো গাড়ি+রেস্তোরাঁ

আমার মা'র ইচ্ছে = আমি+কৃষ্ণকলি

অর্থাৎ -

sh+sw = hr = jg+bc+rstnt

mw = sh+kr

তাহলে -

sh+sw = hr ---------- 1

hr = jg+bc+rstnt ---------- 2

mw = sh+kr ---------- 3

এবার -

1-3 = (sh+sw)- (sh+kr) = hr-mw

অথবা

sw-kr = hr-mw

বা

sw-kr = jg+bc+rstnt-mw putting the value from 2

অথবা

sw+mw = kr+ jg+bc+rstnt

অর্থাৎ

আমার ইচ্ছে+মা'র ইচ্ছে = কৃষ্ণকলি+জগন্নাথ+কালো গাড়ি+রেস্তোরাঁ

সেদিন রাতে বেশ দেরী করে ঘুম এল। অনেক'কটা ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন দেখলাম। যেমন আমি আর হিরণ্ময়ী জগার লম্বা কালো গাড়ি চেপে অনেক দূরে কোথাও চলে গেছি। বেশ খিদে পেয়ে গেল। ঝিং চ্যাক ঝিং চ্যাক বাজনা বাজছে, ডিস্কো লাইট জ্বলছে। সামনে একটা রেস্তোরাঁ। সেখানে কাঁচের জানলা। এসিটা এত জোরে চালানো যে বেশ ঠাণ্ডা লাগছে।

পর পর প্লেটভর্তি খাবার আসছে। কী খাবার বুঝতে পারছি না। আবার চিনামাটির বিভিন্ন পাত্রতেও খাবার রাখা আছে। ঢাকনা দেওয়া। স্বপ্নে এও দেখলাম কোথা থেকে হঠাৎ কৃষ্ণকলি আমাকে ফোন করল। বলল, 'তোমার মা কথা বলবে। মা খিল খিল করে হেসে বলল, ঢাকনা সরিয়ে দেখলেই হয় দামি দামি খাবারের রকম সকম। সরিয়ে দেখলাম -

প্রথম বাটিতে তেলেভাজা।

দ্বিতীয় বাটিতে তেলেভাজা।

তৃতীয় বাটিতে তেলেভাজা।

হিরণ্ময়ী বলল আজকাল তেলেভাজাও জাতে উঠে গেছে। বিল আসবে হাজার টাকার। ঘুম ভেঙে গেল। গল গল করে ঘামছি। একটা তেরচা মতো রোদের ফলা মাথায় এমনভাবে পড়েছে ঠিক যেন মাথায় ড্রিল করে চাঁদি ফুটো করছে।

ভোরের স্বপ্নটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে সারাটা দিন কেটে গেল। তার সঙ্গে আবার আমার মাথায় সেই ইকুয়েশনটাও ঘুরছে, যার মূল কথা আমার আর মা'র উভয়েরই ইচ্ছে এই যে - জগন্নাথ এবং কৃষ্ণকলি দুজনে মিলেই কালো গাড়িতে চেপে রেস্তোরাঁতে খেতে যাক। এই সমীকরণ অনুযায়ী কাজ করলে কারো কোন ক্ষতি তো হবেই না বরং সকলেই লাভবান হবে।

১) আমি হিরণ্ময়ীর ঘনিষ্ঠ হতে পারব।

২) আমার মা ছেলের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে।

৩) জগন্নাথ একটা ক্যারাটে জানা বডিগার্ড পাবে।

৪) কৃষ্ণকলি একজন লজিক্যালি এবং ম্যাথামেটিক্যালি ডিডাক্টেড সঙ্গী পাবে।

বিকেলবেলা কৃষ্ণকলির সঙ্গে দেখা করে ওকে ইকুয়েশনটা ভালকরে বোঝালাম | ও প্রথমে ভীষণ রেগে গেল | জগন্নাথকে ওর মোটেও পছন্দ নয় | গলায় সোনার চেন তথা লকেট ঝোলানো পুরুষ মানুষ এবং কালো রঙের মোটর গাড়ি - দুটোই ওর কাছে সমান অসহ্য | কিন্তু আমার মাকে ও অসম্ভব ভক্তি শ্রদ্ধা করে | আমার এবং মায়ের দুজনের সমীকরণে প্রমাণিত ইচ্ছেটাকে সম্মান দেওয়াটাও যে ওর উচিৎ এই যুক্তিটাও ফেলতে পারল না |

জগন্নাথ রাজি হবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে আমি ভণিতা করে বললাম, 'সে দায়িত্ব আমার |'

জগন্নাথ কৃষ্ণকলিকে কালো গাড়িতে চাপিয়ে বাইপাসের ধারে সেই রেস্তোরাঁর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল |

কৃষ্ণকলি সেদিন হেব্বি সেজেছে | কালো চেহারায় কালো লিপস্টিক, কালো কালো গয়নায় নকল ডায়মন্ড চকচক করছে | নীল রঙের শাড়ি | দোকানে সাজিয়ে রাখা ম্যানেকুইন হেঁটে চলে বেড়ালে যেমন লাগে ঠিক তেমন লাগছিল |

আমিও হিরণ্ময়ীর সঙ্গে তক্ষুনি দেখা করলাম এবং আমার একই ইকুয়েশনটা ওকেও বোঝালাম | জগন্নাথ আর কৃষ্ণকলি যে ইতিমধ্যেই বাইপাসের সেই রেস্তোরাঁর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে তাও জানালাম |

হিরণ্ময়ী সব শুনে ভীষণ রেগে গেল | ওর কথামতো আমার মোপেডেই ওকে চাপিয়ে বাইপাসের ধারে সেই রেস্তোরাঁতেই দুজনে গিয়ে ঢুকলাম | আমি আগে কোনদিন এখানে আসিনি | এক্কেবারে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ কাঁচের লিফটে জীবনে সর্বপ্রথম উঠলাম | রাস্তা দিয়ে হুস হুস করে একের পর এক গাড়ি যাচ্ছে | আলোর মালায় সেজেছে কলকাতা |

আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে কৃষ্ণকলি ভীষণ রেগে গেল | জগন্নাথও খুব রাগী রাগী ভান করল | হিরণ্ময়ী তো আগে থেকেই রেগে ছিল | প্রথমে তিনজন মিলে আমাকে; পরে হিরণ্ময়ী জগন্নাথকে ও আমাকে এবং সবশেষে রেস্তোরাঁর শান্তি ভঙ্গের জন্য অন্যান্য খদ্দেররা আমাদের চারজনকে - প্রচণ্ড তুলোধোনা করল |

ভিন্ন ভিন্ন কারণে একইসঙ্গে এত বাছা বাছা বিশেষণ এবং বিশেষ্যের ব্যবহার কমই দেখা যায় |

ইতিমধ্যে জগন্নাথের অর্ডারি খাবারগুলো চলে আসাতে রেহাই পেলাম আমরা | এক নাগাড়ে চিৎকার করতে করতে হিরণ্ময়ী ও কৃষ্ণকলি উভয়েই প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল | ওরা দুজনে খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়াতে আমি আর জগন্নাথ কিছুটা স্বস্তি পেলাম | একদম কোনাকুনি কিছুটা দূরে কাঁচের জানালার ধারে দুজনে গিয়ে বসলাম | জগন্নাথ মুচকি মুচকি হাসতে লাগল | কিন্তু আমার কিরকম একটু দুঃখ হ'ল |

মনের দুঃখে জীবনে সেবারই প্রথম হুইস্কি খেলাম - বেবিকর্ন ভাজা সহযোগে |

সত্যি বলতে কি, মন্দ লাগল না!

নারী স্বাধীনতার দাঁড়িপাল্লা

হুসনে জাহান

বিশ্বের নারী দিবসে এখন নারীরা বলতে পারে সারা বিশ্বে যে নারী স্বাধীনতা আর নারী সচেতনতার জোয়ার এসেছে তার স্রোতে আজকের মেয়েরা পুরুষের সাথে একভাবে পা ফেলে চলবার দাবী রাখে, যা 'Me too' আন্দোলনের মাধ্যমে নারীরা নিজেদের মত প্রকাশ করবার সহজ উপায় ও উৎসাহ পাচ্ছে। আজকাল কিছু মেয়েরা মোটেই রান্নাবাড়া শিখতে বা সামলাতে বিন্দুমাত্রও আগ্রহী নয়। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কী করবে? তা আজকাল শ্বশুরবাড়িতে কতজনই বা থাকতে যাচ্ছে? তারা যদি খুশি থাকে তো ভাল কথা। মেয়েরা আজকাল শুধু শ্বশুরবাড়ির লোকদেরই নয়, স্বামীদেরও নারীর সমান অধিকার ও স্বায়ত্ত শাসনের চেতনা ও দাবী হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেয়।

আগে শোনা যেত, দেশের শৃঙ্খলিত পরিবেশ ছেড়ে পশ্চিমে পদার্পণ করে অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রী যদি রান্না করে, স্বামী বাসনপত্র ধুয়ে সাহায্য করে। পরে ডিশ-ওয়াশারের প্রচলন হলে তাতে বাসন ঢোকানো, বার করা, সেসব গোছানোর কাজও স্বামীদের ভাগেই থাকত। কিন্তু যখন পুরোপুরি গৃহবাসী স্ত্রীরাও রান্না থেকে শুরু করে বাসনমাজা, বাজার করা সবই পুরুষের ঘাড়ে নিশ্চিন্তমনে চাপিয়ে দেয়, তখন আমাদের মতো পুরনো পন্থীদের কাছে সেটা কেমন যেন বেখাপ্পা মনে হয়। সমান অধিকার মানে কি একের দায়িত্ব অন্যজন বহন করা? জীবনের সব পর্যায়েই তো একটা ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন। কিছু মহিলা নিজেরা রান্না থেকে বাঁচবার জন্য বাইরের খাবারেরই পক্ষপাতী। আবার অনেকে দিনের পর দিন যেমন তেমন কিছু একটা করে পরিবারকে খাইয়ে সন্তুষ্ট থাকে। এসব কি নারী স্বাধীনতার পক্ষেও একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যায় না?

কখনো এমনও দেখা যায় যেখানে শুধু স্বামীই আয় করে, সেখানেও স্বামীর ভাগে থাকে সাপ্তাহিক বাজার হাট, জামাকাপড় কাচা, দিনের শেষে রান্নায় হাত বাড়ানো এবং অনেক সময় রান্নাটাও করে দেওয়া, রোজকার বাসনপত্র ধুয়ে তুলে রাখা, ছুটির দিনে ভ্যাকুয়াম করা, গাড়ি পরিষ্কার, ঘাস কাটা ইত্যাদি। তাছাড়া বাসার টুকিটাকি মেরামতের কাজ তো অহরহই লেগে থাকে। স্ত্রী গাড়ি চালাতে অপারগ হলে ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে আনা নেওয়া করা, দেরী হলে ডে কেয়ারে অপেক্ষা করানো, এগুলোও পতি পরম গুরুর কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে যায়। অনেক সময় নিজের ও ছেলেমেয়েদের সকালের নাস্তা, দুপুরের টিফিনের খবরও তো স্বামীকেই রাখতে হয় কারণ স্ত্রীর যে বেলা ১০টার আগে বিছানা থেকে ওঠা সম্ভব নয়। সে যে বাকী সময় নিজের ও সংসারের দৈনন্দিন খাওয়াপরার ওপর দৃষ্টি রাখছে, তাই কি যথেষ্ট নয়! তারপর ছুটির দিন পার্টিতে পাল্লা দিয়ে সাজগোজের ব্যবস্থাটাও তো স্বামীর অর্থের ওপর নির্ভর করে। যদি এ নিয়মের কোনোটাতে অন্যথা হয়, তাহলে সে রাতের ঘুম এবং বিশ্রামের যে দফা রফা। এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল নয় এবং এরকম সংসারে শান্তি রক্ষার দায়িত্বে বিচক্ষণ গোবেচারা স্বামী চুপচাপ সংসারের নিয়ম মেনেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে মনস্থ করে নেয়। অবশ্য এটা হ'ল নারী স্বাধীনতার আরেক দিকের এক চরম দৃষ্টান্ত।

একথা অনস্বীকার্য নয় যে এই নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের দাপটে স্বামী ও শ্বশুর গৃহবাসীদের সাথে গৃহবধূর এই ধরনের উদ্ধত ও অসহযোগী ব্যবহারের পেছনে নারী জীবনের বহুযুগের কষ্টকর কাহিনীর ইতিহাসই ইন্ধন জুগিয়েছে। এজন্য আজকের বেপরোয়া মহিলাদের একতরফা দোষী সাব্যস্ত করা মোটেই সঙ্গত হবে না। দীর্ঘদিন ধরে, বিশেষ করে সনাতন ও গরীবের ঘরের মেয়েকে বিয়ে করে তাকে বাড়ির এক দাসীর চেয়ে উর্ধ্বে মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তাদের ওপর অহেতুক যথেচ্ছাচার ও অবিচার করা হয়েছে এবং এখনও অনেক ক্ষেত্রেই সেরকম প্রথাই চলে আসছে। পুরুষ বিবাহের প্রাক্কালে সামর্থের বাইরে যৌতুক ও পণ দাবি করেছে এবং এখনো করে থাকে, একাধিক বিবাহ করে, এবং অন্যান্য অনাচার, ব্যভিচারেরও ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত এখনো বর্তমান। নিরুপায় অসহায় মহিলারা এসমস্তই সহ্য করে জীবন চালিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এরকম অবর্ণনীয় ও দুর্বিষহ নির্যাতন ভোগ করার পরই তো আজ নারী তার যুদ্ধংদেহী রণমূর্তি ধারণ করতে বাধ্য ও বদ্ধ পরিকর হয়েছে।

বাসার এক কাজের মহিলার কাছে শোনা তার শাশুড়ি তাকে পিঁড়িতে বসে ভাত খেতে দিত না কারণ আরাম করে বসলে যে বেশী খেয়ে ফেলবে। খাবার পাতে লবণ নিলেও নাকি সে বেশী খেয়ে ফেলবে। আরো শুনেছি, অনেক বিধবা মা'র অভাবের সংসারে ছেলের বিয়ে দিতে দারুণ আপত্তি কারণ, তাহলে তাদের বাকি সন্তানদের মানুষ করার খরচেই শুধু টান পড়বে না,

নিজের কাছ থেকে সংসার খরচের টাকাটাও হাতবদল হয়ে বৌয়ের আয়ত্তে চলে যাবে | তারপর ছেলের সন্তানরা জন্ম নিলে যে ক্রমশঃ তাদের বাবার রোজগারের ভাগীদার হয়ে আরো অসুবিধার সৃষ্টি হবে | সে সব শাশুড়ি শুনেছি সন্তানসম্ভবা পুত্রবধূকে যত্নআত্তি করা বা সহানুভূতি দেখানো তো দূরের কথা, ছেলের রোজগারে আরো ভাগীদার বাড়াবার দায়ে বৌকে অকথ্য ভাষায় দুর্ব্যবহার করতে বাকি রাখে না |

আর পতি পরম গুরুর সাথে পতিপরায়ণা স্ত্রীর সম্পর্কটা কী রকম চলে তাহলে? সারাদিন সবার মনোরঞ্জনের জন্য পরিশ্রম করে, স্বামীর সেবা ও খাওয়াদাওয়ার পর শাশুড়ির গা-হাত-পা টেপা ইত্যাদি আরো কাজ বাকি থাকে | এরকম মানসিকতার স্বামীরা গ্রামে কি শহরে, স্ত্রী উপার্জন ক্ষমতা থাক বা না থাক, তাদের সেবা যত্নে কিন্তু কোনো ত্রুটি মোটেই বরদাস্ত করতে অভ্যস্ত নয় | কারণ এসব স্বামীরা এক গ্লাস জলও নিজে নিয়ে খেতে জানে না | আর আজকের আধুনিকতার প্রভাবে শিক্ষিত ও স্মার্ট স্ত্রীরা ঘর-সংসার দেখে, সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে, স্কুল ও কোচিং-এ তাদের আনা নেওয়া করে, বাজার করে, বিল জমা দেয় - সবই করতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত বোধ করে তারা | কিন্তু তাদের স্বামীরা সেই পুরনো দিনের নিয়মে এখনো অফিস থেকে ফিরে তৈরী চা, নাস্তা ও মনের মতো সেবাযত্নসহ আয়েশ করবার অভ্যেস ছাড়তে পারছে না |

হ্যাঁ একথা সত্যি যে আমাদের সনাতনী প্রথায় পুরুষের দায়িত্ব ছিল শুধু রোজগার করা আর মেয়েদের কর্তব্য ঘর সামলানো | আমার বাবা বলতেন দুজনের মধ্যে ডিভিশন অফ লেবর মানে, কাজ ভাগাভাগি করে রাখা প্রয়োজন | যার ভাগে যে কাজ সেই সামলাবে, প্রয়োজনে পরামর্শ ও সাহায্য নেবে | কিন্তু একজনের কাজে আরেকজন মাথা গলাবে না | তাই আমার বাবা কখনো মা'র কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না, আর মা'ও বাবার কাজ মনমতো না হলেও তাতে অহেতুক মাথা গলাতেন না | মা আমাদের বকাঝকা করলে বা মার দিলে বাবা চুপ করেই তা দেখতেন | আমরা অভিমান করে না খেলে অথবা বাসা থেকে চলে গেলে বাবাই সামলে নিয়ে আমাদের সেধে খাওয়াতেন বা নানাবাড়ি থেকে নিয়ে আসতেন | কিন্তু মা'র শাসনের বিরুদ্ধে কোনোরকম উচ্চবাচ্চ করতেন না | এ ধরনের সম্পর্ক সচরাচর বিরলই বলা যেতে পারে | আমার মায়ের জীবনে কোনো আক্ষেপ ছিল না বলা ভুল হবে, তবে বাবার মুখ চেয়েই তিনি অনেক সখ-আহ্লাদ, অভাব ও অপূর্ণতা সয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন | একথা এখন বুঝতে পারি যে তাঁরা দুজনেই ভাল মানুষ ছিলেন এবং দুজনেরই একে অপরের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল | তাই কোন কাজ পছন্দ না হলেও তা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি না করে বুঝে এবং মানিয়ে নেবারই চেষ্টা করতেন | তবে বাবা চলে যাবার পর বাবার জন্য দুঃখ প্রকাশের সাথে নিজের জীবনের ঘাটতি ও দুঃখের কথা মনে পড়লে মা আমাদের কাছে তা আফসোসের সাথেই বর্ণনা করতেন | কাজেই একথা অস্বীকার করা যায় না যে স্বামী বা তার বয়োজ্যেষ্ঠদের অন্যায় উৎপীড়ন যুগ যুগ ধরে সহ্য করার পরই নারী আজ এই রণমূর্তি ধারণ করার প্রয়োজনে হয়তো বা একটু অতিরিক্তই বাড়াবাড়ি করে ফেলছে |

তবে এতদিন পর নারীর স্পর্ধার দুঃসাহসী 'মি টু' আন্দোলনের প্রতি আমার ১৬আনা সমর্থন থাকলেও আমার মতে মেয়েরাও নিজেদের চলন-বলন সাজ পোশাকে কিছুটা রুচি, সংযম ও বিবেচনার পরিচয় দিলে বোধহয় অপর পক্ষের দৃষ্টি, নিন্দা ও আক্রমণের হাত থেকে আরো সহজে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হত | পুরুষের মুখে এ ধরনের উক্তি শোনা যায় যে 'গ্রীষ্মের প্রচন্ড উত্তাপে যদি তৃষ্ণার্ত মানুষের সামনে গ্লাসভরা ঠান্ডা পানি রেখে বলা যায়, খবরদার - ওদিকে হাত বাড়ানো তো দূরের কথা, চোখ তুলে তাকালে বা মনে মনে দুরভিসন্ধি পোষণ করলেও কিন্তু মোটেই ভাল হবে না | এক্কেবারে বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব বলে দিলাম!' তাই মনে হয় সাবধানতা ও সতর্কতা হয়তো বা নারীদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে সহায়ক হতে পারে | নিজে সাবধানতা অবলম্বন করে বা সামলিয়ে চলার পরও যদি নারী কামনা বাসনার স্বীকার হয়ে পড়ে, তখন আর আততায়ীর আত্মসমর্থনে কোনো যুক্তি ও অজুহাত থাকতে পারে না | তবে সংযত ও রুচিসম্মত থেকেও যে 'মি টু'র পরিস্থিতি থেকে সর্বদা রক্ষা পাওয়া যাবে সে প্রতিশ্রুতিও তো কেউ দিতে পারে না!

আজকাল সিনেমায়, খেলাধুলা, সাঁতার এবং লম্ফ-ঝম্ফের প্রতিযোগিতায়, সাগর সৈকতে ও দৈনন্দিন জীবনেও দেখা যায় যে কিছু মহিলা কখনো নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতা জাহির করবার তাগিদে বা অন্য যে কোনো কারণে ন্যূনতম আবরণ পরিধান করছে কিংবা তাদের বাধ্য করা হচ্ছে | স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ ব্যবস্থায় দর্শকের ও পার্শ্ববর্তীদের মনোরঞ্জন হতে পারে, বক্স অফিসেও রেকর্ড ব্রেক হবে, কিন্তু

তাতে কী মহিলাদের আত্মরক্ষার পথ সুগম হবে? যদি যুক্তি অনুযায়ী এ ধরনের পোষাকে শরীরের পেশী সহজে নড়াচড়ায় সাহায্য করে, তবে সেটা কি শুধু মেয়েদের বেলাতেই প্রযোজ্য! পুরুষের শরীর চর্চার জন্য কি অন্য হিসাব? তাদের কেন পা ঢাকা লম্বা প্যান্ট আর রুচিসম্মত গেঞ্জি নড়াচড়া, লাফালাফিতে অসুবিধা করে না তা আমার বোঝার বাইরে। তাই মনে হয়, নারী স্বাধীনতার সঙ্গে সব ক্ষেত্রেই মহিলাদেরও নিজস্ব মতামত, রুচি ও বিবেচনা প্রয়োগের প্রয়োজন।

যাক, সামাজিক অসামঞ্জস্যের কথা বলা হ'ল। যে ব্যক্তিগত কথা বলতে আজ আমি কলম ধরেছি, তা হ'ল আমার মা কীভাবে আজকের যুগের অতিরিক্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা সচেতন মেয়েদের থেকে ভিন্ন নিয়মে আমাকে রান্নাবান্না, ঘরকন্না, স্বামীসেবা শিখিয়ে সুগৃহিণী বানাতে সচেষ্ট ছিলেন। আমি নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকেই মায়ের কড়া হুকুমে প্রতি শনি রবিবার রান্নাঘরে রাঁধুনির কাছে গিয়ে রান্না শিখতে হত। আমি এ ব্যাপারে দারুণ হৈ চৈ করেও কোনো ফল হয়নি। আমার প্রথম আপত্তির কারণ ছিল আমি তো মোটে বিয়ে না করেই জীবন কাটাবার পণ করেছি, সেখানে রান্না শেখার প্রয়োজনটা কোথায়? মা বললেন, 'তুমি রান্না না জানলে তোমার রাঁধুনিকে কীভাবে শেখাবে বা বুঝিয়ে দেবে? যাও, রান্নাটা শিখে রাখো, অন্তত ভালমন্দ রান্নাটা তো তখন রাঁধুনিকেও বোঝাতে পারবে।' বুঝলাম তর্কে কোনো ফল হবে না। বরং হিতে বিপরীতই হবে। কাজেই মারের হাত থেকে বাঁচিবার তরে পরের শনিবার হইতে লক্ষ্মী দুহিতার মতো রান্না ঘরে উপস্থিত হইলাম।

রাঁধুনিটির আমাদের ওপর মায়া হ'ল; তাই বলল, 'আমি সব তৈরী করে গোছায়ে দিমুনে, আপনি শুধু এইখানে বইসা দ্যাখেন।' মা জননী রাঁধুনির এই ফাঁকিবাজি বুঝতে পেরে তাকে কড়া শাসনে সাবধান করে দিলেন। ফলে আমি সব ধরনের মাছ, মাংস, সবজি, লুচি, পরোটা, সিঙ্গাড়া, নিমকি, মোহনভোগ, পায়েস, পোলাও, কোর্মা, কালিয়া সব মুখরোচক রান্নাতে নবম ও দশম শ্রেণীতে থাকাকালীনই মোটামুটি তালিম পেয়ে গেলাম। কিন্তু দাঁড়াও, এর মাঝে কিন্তু বিশাল এক কিন্তু রয়ে গেছে। মুখরোচক ও অভিজাত রান্না তো হ'ল, কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ রান্নার এবং রান্না সম্পর্কিত কাজকর্মে যে আমার বিশাল ঘাটতি রয়ে গেল সে খবর কে রাখে? বাঙালি খাবারের যা মূল কথা - ভাত, ডাল, রুটি আর দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে খড়ি বা কয়লার চুলো জ্বালানো - সেসব ব্যাপারে আমি বিদেশীই থেকে গেলাম। তার মানে পোলাও, কোর্মা ইত্যাদি শেখা হলেও চুলো ধরাতে না জানলে আর রোজকার ডাল ভাত, রুটি বানাতে না জানলে যে জীবনের ষোলআনাই ফাঁকি, সে জ্ঞান তো আমার মায়ের হয়নি, তাহলে আমারই বা হবে কেমন করে?

আমার বাবা মা পড়াশোনা, খেলাধুলো, গান-বাজনায় উৎসাহিত করতেন এবং মনোযোগ দিতে বলতেন। সব ধরনের মেয়েলি ও ঘরোয়া আলাপ আলোচনা থেকে আমাকে আড়াল করে রাখতেন। আর আমাকে ছেলেভুলানো আশ্বাস দিতেন যে বিয়ের পিঁড়িতে আমার কখনো বসতে হবে না। পড়ালেখা শিখে ভালভাবে পাশ করে চাকরি করবার জন্যই যেন আমি তৈরী হবার চেষ্টা করি। বাংলা নাটক-নভেল পড়া, বড়দের সিনেমা দেখা ছিল নিষিদ্ধ। তাই বলে যে মা'র বইগুলো কখনো লুকিয়ে পাতা উলটিয়ে দেখিনি তা আমি হলফ করে বলব না। সম্পর্কে পিসতুতো, মাসতুতো, মামাতো, জ্যাঠতুতো উঠতি বয়সের ভাইদের আমার ধারে কাছেও আসবার অনুমতি ছিল না। আর নতুন বিবাহিতা আত্মীয়াদের ওপর কড়া নিষেধ থাকত যেন কোনরকম ব্যক্তিগত কথা আমার সামনে আলোচনা না করা হয়। কাজেই পড়ালেখা, খেলাধুলো শিক্ষিকাদের প্রিয়পাত্রী হবার চেষ্টা, সরল সহজ বুদ্ধিমতী বান্ধবীদের সাথে খেলা-হাসি-গল্প করেই আমার দিন কেটে যেত।

মা যখন মেয়ের যৌবনের চৌকাঠে পদার্পণ করবার সময় বিব্রত বোধ করে, তখন মেয়ের জন্য সে সময়টা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মেয়ে যেন তাঁদের অপছন্দের চিন্তা ভাবনা থেকে দূরে থাকে তার জন্য নভেল নাটক পড়বে না, বড়দের সিনেমা দেখবে না, বৈবাহিক আলোচনায় যোগ দেবে না, ছেলেদের কুৎসিত ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করবে, পুরুষের হাতে বিব্রত হবার ভয় থাকলে একলা কোথাও যাবে না - ইত্যাদি। সব মেয়েদেরই অভিজ্ঞতা আছে পথেঘাটে, চলন্ত ট্রামে-বাসে, বাজারে, সিনেমায় কীভাবে 'me too'-র পরিস্থিতিতে বিড়ম্বিত হতে হয়। কলকাতার ফ্ল্যাটের দোতলার বারান্দায় বিকেল ও সন্ধ্যায় দাঁড়িয়েও তো নিস্তার পাওয়া যায়নি। মা-মাসিদের সাথে সেসব কথা মুখ ফুটে আলাপ করতে পারলে, তাদের সমর্থন পেলে অবস্থা অনেকটা সহনীয় হতে পারে। তাহলে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয় না। তাই আজকাল যখন পাশ্চাত্যের কথা বাদ দিয়ে আমাদের প্রাচ্যের উন্নতিকামী দেশের মেয়েদের রাতের প্রথম প্রহরের পর

বা গভীর রাতে ডিউটি শেষে একা রিক্সা, অটোতে বা বাসে নির্জন রাস্তা দিয়ে অতি সাহসিকতা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে বাড়ি ফেরবার কথা শুনি, অজানা বিপদের ভয়ে আমার শরীর শিউরে ওঠে|

এর পর যা সব মেয়েদের হয়, আমারও তাই হ'ল| আমার নানান ধরনের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এক শিক্ষিত পরিবারের মেধাবী, চরিত্রবান সুযোগ্য পাত্র নির্বাচিত হ'ল আমার জন্য| আমি তখন দশম শ্রেণীতে পড়ি| মা বললেন, 'তোমার বাবা বলে দিয়েছেন, বি এ পরীক্ষা পাশ করবার আগে মেয়েকে তিনি বিবাহ দিতে সম্মত নন| ব্যস, এখন বি এ পরীক্ষা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে যাও|' পাত্রও বি এ অবধি পড়াবার প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে তার হাতে আমাকে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন আমার অভিভাবকরা|

বিয়ের পর্ব সমাধা হলে তো শ্বশুরবাড়িতে স্থানান্তরিত হলাম| পরদিনই বৌভাত| তখনকার দিনে এত শত মিলনায়তন ছিল না আমাদের দেশে| নিজ নিজ বাসাতেই আর প্রয়োজন বোধে কোনো বন্ধুসুলভ প্রতিবেশীর বাসার কিছু অংশ যোগ দিয়ে উঠোন বাগান মিলিয়ে অনুষ্ঠান হত|

শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সকলের মনোরঞ্জনের দিকে মন দেবার শিক্ষা অর্জন করলাম | লেখাপড়ার দিকে বেশি মন দিতে পারলাম না| তখনকার দিনে বিয়ের পর সংসারধর্মই ছিল বড় ধর্ম| স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করা বাড়ির বৌদের বিশেষ কাজ ছিল|

বোঝা যায় এ ধরনের কড়াকড়ি ধরাবাঁধা নিয়ম-শৃঙ্খলা দিয়ে বেঁধে রাখার চেষ্টার কারণেই আজ নারী পুরোপুরি উল্টোমুখী হয়ে পালাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে যার ফলেই সম্ভবতঃ একেবারে বিপরীত আচার ধর্মেই আকর্ষিত হচ্ছে| শুধু মারধোর শারীরিক নির্যাতনই নারীর আত্মমর্যাদার হানি করে না, নারীর স্বাভাবিক, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঊর্ধ্বগতি, বিকাশ ও সমানাধিকারের গলা চিপে রাখলে আজকের শিক্ষিত আত্মসচেতন নারী তা কোনোমতেই বরদাস্ত করতে রাজী নয়| তাই তো আজকালের ছেলে বা মেয়ে অ্যাডাল্ট হবার সাথে সাথে সবাইকে ভালভাবেই নিজেদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবী ও অধিকার চরমভাবে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে | যেন জন্মদাতা, অভিভাবক ও পারিপার্শ্বিকতা তাদের সব কর্মকান্ড ও বাসনা কামনার উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি না করে| বরং তাদের এগিয়ে যাবার পথ সুগম করে দেয় এবং সহায়তা করে| এখন সেটাই দাঁড়াচ্ছে উভয়ের মাঝে সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র পথ| তবে জীবনের সব ক্ষেত্রেই যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন, সে কথা সকলেই উপলব্ধি করে চলতে পারলে সব দিকে থেকে মঙ্গল|

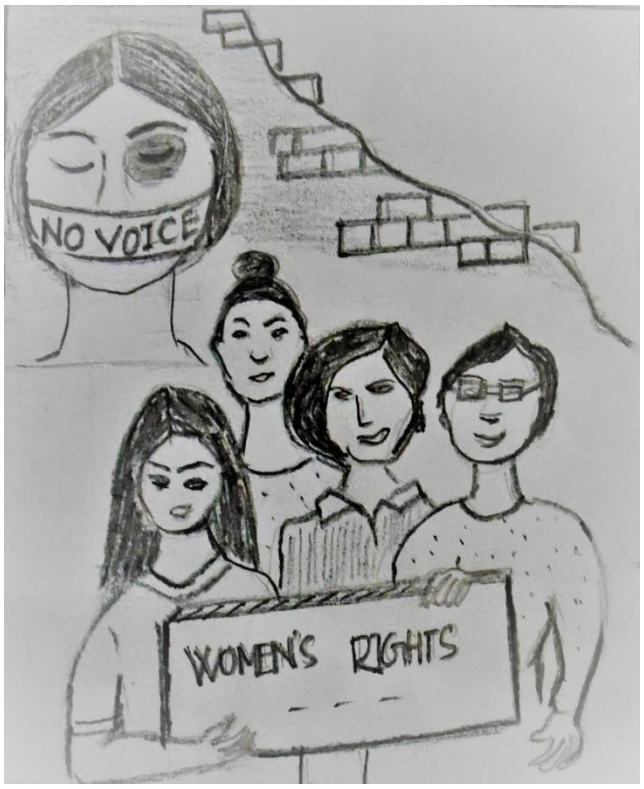

দ্বিধারা

সফিক আহমেদ

১

পাখির ডাকে ঘুমটা ভেঙে যায়। তাও যদি আসল পাখি হত, এ তার বরের আদিখ্যেতা করে কিনে আনা কলিং-বেল। অসময়ে বেজে উঠলে মনে হয় কাকের ডাকের থেকেও বেসুরো। রবিবারের সকালে একটু যে গড়িমসি করে উঠবে তারও জো নেই। রাজধানী এক্সপ্রেস, দুরন্ত এক্সপ্রেস যদিও দু'দশ মিনিট লেট করবে, লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল হ'ল সময়ানুবর্তিতার চূড়ান্ত। ঠিক সকাল পৌনে ছটায় এনে পৌঁছে দেবে তাদের জীবনের লাইফ-লাইন মিনতিমাসিকে। ঘরে ঢুকেই ঝাড়ু হাতে মাসি নেমে পড়ে ভারত-পরিষ্কার প্রকল্পায়নে। হাতের এক এক টানে সরিয়ে দেয় ছাত থেকে মেঝে পর্যন্ত ঝুলে থাকা বাহারি পর্দাগুলো যারা সযত্নে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করে রাতের অন্ধকারকে। পুবমুখো জানলা পেরিয়ে আছড়ে পড়া আলো এক মুহূর্তে খান খান করে দেয় আলো আঁধারির রোমান্টিকতা। মাসি দক্ষ হাতে ঝাড়পোঁছ করতে করতে রান্নাঘর, ড্রইংরুম, গেস্টরুম পেরিয়ে এগোতে থাকে বেডরুমের দিকে। রঞ্জনা হা হা করে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে পড়ে - 'খবরদার, দাদাবাবু কাল উইকএন্ডের পার্টি করে এসেছে গভীর রাতে। এখন বিরক্ত করলে আর রক্ষে নেই।'

অসম্পূর্ণ সাফাই অভিযান ছেড়ে যেতে যেতে মাসির বিরস মুখে যেন স্বগতোক্তি শোনা যায় - 'সব মরদগুলোই এক, আমার রেণুর বাপের খোয়ারি ভাঙতেও একবেলা কেটে যায়।'

সকালের ঘুম ভাঙার তিক্ততা কেটে যায় যখন মিনতিমাসির তৈরী গরম ধোঁয়াওঠা চায়ে চুমুক দেয় আর হালকা আওয়াজে শুনতে থাকে তার প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত।

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি।
তোমায় দেখতে আমি পাই নি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাই নি ..."

ঝড়ের বেগে যাবতীয় কাজ সেরে ১০টার মধ্যে বেরিয়ে যায় মিনতিমাসি। আরো চার বাড়ির কাজ সেরে সন্ধ্যা ৬টায় আবার আসবে সেকেন্ড শিফটে।

বেলা বাড়তে রজত উঠেই শুরু করে উথলে পড়া প্রেমের আদিখ্যেতা। এখনো রাতের অনিয়মের রেশ কাটেনি তবুও আদুরে গলায় আবদার, 'আজ ক্লাবে ব্রাঞ্চ। সেজেগুজে তৈরি হও। জেনারেল ম্যানেজার নায়ার আর তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারি সুজান এসেছে শহরে। ওদের এন্টারটেইন করতে হবে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হালকা হলুদ শাড়ি, হস্তশিল্প মেলা থেকে কেনা একটা পোড়া মাটির নেকলেস আর ম্যাচিং দুল পরে, সামান্য প্রসাধন সেরে বেরিয়ে পড়ল গল্ফ ক্লাবের উদ্দেশ্যে।

হালকা শীতের রোদে পিঠ দিয়ে, মখমলের মতো সবুজ গালিচার গল্ফ কোর্সের দিকে তাকিয়ে হরেক রকমের প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য খাবার সহযোগে জিন অ্যান্ড টনিকে চুমুক দিতে দিতে ভালই কাটল সারাটা দিন; তার সঙ্গে মিস্টার নায়ারের বাঙালি-মহিলা-প্রীতি আর স্তুতি শুনতে শুনতে।

এদিকে রজত মশগুল অফুরন্ত বিয়ার সহযোগে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সেক্রেটারি সুজানকে কলকাতার ক্লাব সভ্যতা আর নাইট লাইফ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে। নতুন শহরে বদলি হয়ে আসা সুজানের যাবতীয় সুবিধা, অসুবিধা দেখভাল করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে উদগ্রীব রজত।

মিস্টার নায়ারের থেকে অব্যাহতি নিয়ে কোনোরকমে রজতকে টেনে উঠাতে গিয়েই শীতের ছোট দিন শেষ। পড়ন্ত বিকেলের আলোতেও অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল গল্ফ কোর্সের চোখ জুড়ানো সবুজ।

মিনতিমাসি ইতিমধ্যে অপেক্ষা করছিল বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে। মুখে ভাষার কোনো আগল নেই। কেউ পরোয়া করে না কিন্তু তবু অদ্ভুত সময়ানুবর্তিতা আর দক্ষতা এই মিনতিমাসির। ২ ঘন্টায়, বিকেলের জল খাবার, রাত্রের খাবার আর সকালের ব্রেকফাস্টের জোগাড় করে বেরিয়ে যাবে ৮টার লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ধরতে। রঞ্জনা গত জন্মের কোনও সুকর্মের ফল হিসাবে পেয়েছে এই মাসিকে। এই দুজনের কর্মব্যস্ত জীবনের ভারসাম্য ধরে রেখেছে মিনতিমাসিই।

সন্ধ্যেটা সোফায় বসে রিয়ালিটি শো দেখতে দেখতে কাটিয়ে দিয়ে আর্লি ডিনার করে গোছগাছ শুরু। সকাল ৮টায় বেরোতে হবে। নতুন প্রজেক্টের প্রেসেন্টেশন সকাল ৯টায়। রজত তখনও ল্যাপটপ নিয়ে ড্রয়িং রুমে রাত জেগে ওর সেলস রিপোর্ট তৈরি করতে ব্যস্ত। কাল মিস্টার নায়ারকে ইমপ্রেস করতে হবে পরের প্রোমোশনের জন্য। বেডরুমে হালকা নীল আলোটা জ্বালিয়ে চাদর ঢেকে ঘুমানোর চেষ্টা করতে করতে রবিবার শেষ রঞ্জনার।

২

সারাদিন চার বাড়ির কাজ সেরে যখন বালিগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছাল তখন চারধারে ধুন্ধুমার ভিড় | ট্রেন লাইনে কেউ কাটা পড়েছে লেভেলক্রসিং না মেনে, কানে মোবাইল ফোন গুঁজে লাইন পার হতে গিয়ে| ভোগান্তি মিনতির মতো নিত্য যাত্রীদের|

শেষপর্যন্ত লোকাল এসে যখন নামাল ধপধপি স্টেশনে, সেখানে তখন চারদিক সুনসান | কাঠের সাঁকো পেরিয়ে টিনের চাল আর ছেঁচা বাঁশের বেড়া দেওয়া ঘরে পৌঁছে দেখে রেণু বই মুখে নিয়ে ঘুমে ঢলে পড়েছে| রেণুর বাপ হারান নেশার ঘোরে ঝিমোচ্ছে|

তড়িঘড়ি দুটো চালেডালে ফুটিয়ে রেণুকে তুলতে না তুলতেই হারানের খিস্তি খেউর শুরু 'এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি? আমরা বাপ বেটিতে না খেয়ে বসে আছি তার খেয়াল নেই? হারামজাদি, ফের যদি দেরি করিস তো লাথি মেরে বার করে দেব, বুঝলি?'

রোজকার মতো এই অকথ্য গালিগালাজ শুনতে শুনতেই মিনতি খাবার বেড়ে দিয়ে নিজেও খেতে বসে | তারপর এঁটো বাসনকোসন সরিয়ে রেখে একধারে কাঁথামুড়ি দিয়ে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে| মিনতির রবিবার শেষ| কাল আবার পৌনে পাঁচটার লোকাল ধরতে হবে|

৩

কোনো কোনোদিন রজত সকালে রঞ্জনাকে অফিসে নামিয়ে চলে যায় ওর কাজে| আজ আর সে সুযোগ নেই| কোনোরকমে মাসির দেওয়া চা খেতে খেতে উবের ডেকে ব্রেকফাস্ট প্যাক করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রঞ্জনা|

অফিসে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই সোমনাথের ডাক | 'রঞ্জনা, তোমার প্রেসেন্টেশন তৈরী তো? চট করে একটা ডেমো রান করো |' হাই-প্রোফাইল ক্লায়েন্ট আসছে ব্যাঙ্গালোর থেকে | ইমপ্রেস করতে পারলে পরের সপ্তাহে ব্যাঙ্গালোরে আর তারপর কর্পোরেট হেড কোয়ার্টার লন্ডনে যেতে হবে ফাইনাল প্রেসেন্টেশন আর কনট্র্যাক্ট সই করতে| এই কনট্র্যাক্ট তাদের ব্যবসার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে| সোমনাথ কম বয়সেই নতুন বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হয়েছে নিজের উদ্যোগে | অদম্য উৎসাহ আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর সোমনাথের সংস্পর্শে এলেই ভাল কাজ করার প্রেরণা এসে যায়|

স্যান্ডউইচ আর কফি খেয়ে সারাদিন বক বক করার পর ক্লান্ত হয়ে ডেস্কে বসেছিল রঞ্জনা| পেছন থেকে এসে পিঠ চাপড়ে উচ্ছ্বসিত সোমনাথ তার স্বভাবসুলভ চওড়া হাসি ছড়িয়ে সুখবরটা দিলেন, ওদের খুবই পছন্দ হয়েছে বিজনেস প্রপোসাল| বেঙ্গালুরু ফিরে গিয়েই বিজনেস মীট-এর ইনভিটেশন পাঠাবে|

'চলো একটু সেলিব্রেট করা যাক | আমি তোমায় নামিয়ে দেব বাড়িতে|'

সোমনাথ বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও বিজনেস লাঞ্চে যায়নি, তাই এবার আর না করল না রঞ্জনা|

প্রথম শীতের বিকেলে ক্যালকাটা ক্লাবের লবিতে বসে, সোমনাথের সুপার অ্যামবিটিয়াস বিজনেস প্ল্যান শুনতে শুনতে, পিঙ্কলেডি ভদকা ককটেল সহযোগে ভেটকি মাছের ফ্রাই আর তার কাজের প্রশংসায় সারাদিনের ক্লান্তি দূর হয়ে মনটা ভরে যাচ্ছিল একটা রিনরিনে ভাল লাগায় | সোমনাথ একের পর এক হুইস্কি শেষ করছিল | একটু দেরিই হয়ে গেল উঠতে উঠতে | বাড়িতে যেতে প্রায় নটা | রজত এসে পৌঁছায়নি তখনও | গরম জলের শাওয়ার চালিয়ে দাঁড়াতেই সারা দেহে একটা উষ্ণতা অনুভব করল রঞ্জনা আর অনুভব করল রজতের পীড়াদায়ক উদাসীনতা | ভেজা চুল মুছে ডাইনিং টেবিলে মিনতিমাসির সাজিয়ে রাখা খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে শুনছিল Beethoven-এর Moonlight Sonata (first movement)| বিটোভেনের এই বিখ্যাত শান্ত মাস্টারপিস পিয়ানো সোনাটা দূরে সরিয়ে দিল পার্থিব চিন্তা-ভাবনাগুলো আর পুরোপুরি একটা শান্ত সমাহিত মেজাজ তৈরী করে দিল | শুনতে শুনতে সোফাতে বসেই ঘুম এসে গিয়েছিল | বেশ রাত্রে রজত এল সামান্য অপ্রকৃতিস্থ হয়ে| খাবার না খেয়ে কোনোরকমে এলিয়ে পড়ল বিছানায় | চাদরটা টেনে দিয়ে আলো নিভিয়ে বিছানার অন্য প্রান্তে শুয়ে পড়ল রঞ্জনা| কাল আবার নতুন দিন শুরু হবে|

৪

আজ একটু তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়েছে মিনতিমাসি | এক বাড়ির বৌদি গেছে বাপের বাড়ি | দাদাবাবু একা থাকবে বলে বৌদি তাকে বলে গেছে সেখানে কাজে যেতে হবে না দুদিন| বিকেল বিকেল শেষ বাড়ির কাজ সেরে নিত্যসঙ্গী লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ধরে যখন ধপধপি স্টেশনে নামল তখনও সন্ধ্যে হয়নি | স্টেশনের বাইরে পার্টি অফিসে তখন দেদার ভিড় | নতুন কনট্র্যাক্টর বরাত পেয়েছে রাস্তা মেরামতের; তাই এক'শ দিনের কাজের জন্য লোকজনের নাম নিচ্ছে পার্টি অফিস থেকে| শুনে কী জানি কী মনে হ'ল মিনতিও দাঁড়িয়ে পড়ল লাইনে| অনেক

ধস্তাধস্তির পর যখন পৌঁছাল টেবিলের সামনে তখন নাম নেওয়া প্রায় শেষ | অনেক কাকুতি মিনতি করে হারানের নামটা লিস্টিতে তুলে হাতে পেল নম্বর লেখা একটা চিরকুট | সেটা নিয়ে কাল দেখা করতে হবে কনট্র্যাক্টরের অফিসে | তারা যদি চায় তো কাজ দেবে দিন মজুরের | খুশিমনে রাস্তার ধারের দোকান থেকে আধখানা কাটা মুরগি কিনে বাড়ি ফিরল মিনতি |

রেণু মাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে ভারি খুশি | মিনতি বলল, 'রেণু, আয় আমাকে একটু সাহায্য কর | আজ তোদের ভালকরে মুরগির মাংস খাওয়াই | কাল থেকে তোর বাপকে কাজে পাঠাব |' রেণু মহা উৎসাহে মাকে এটা সেটা এগিয়ে দিল আর প্রাণভরে রান্নার গন্ধ নিতে লাগল | কতদিন পর মাংস খাওয়ার লোভে তার চোখ চকচক করছে |

নেশার ঘোরে ঢুলতে ঢুলতে ঘরে ঢুকে হারান নাক উঁচু করে মাংস রান্নার গন্ধতে সুখটান দিয়ে হাসিমুখে বলল, 'আজ কোন বাবুকে খুশি করে এসেছিস যে ঘরে মাংস রান্না হচ্ছে?' এইসব শোনা তার গা-সওয়া হয়ে গেছে তাই কথা না বাড়িয়ে মিনতি বলল, 'তুমি তো জাতে মাতাল তালে ঠিক, মাংসের গন্ধ যখন পেয়েছ, তখন খেয়ে আমায় উদ্ধার করো |'

খাওদাওয়ার পর তার কাছ ঘেঁষে বসে মিনতি বলল, 'এতই যদি বৌয়ের চিন্তা তো আমার আর পাঁচ বাড়ি কাজ করে বাবুদের খুশি করার দরকার নেই | কাল যাবে কনট্র্যাক্টরের অফিসে এক'শ দিনের কাজ নিতে | আমি নাম লিখিয়ে এসেছি পার্টি অফিসে | এই চিরকুট নিয়ে দেখা করবে আর কাজ না নিয়ে ফিরবে না |'

আজ একটু কাছাকাছি শুয়ে পড়ল মিনতি | ভুল করে হারানের গায়ে একটা হাতও গিয়ে পড়ল | নেশা করা, নাক ডাকা মানুষটাকে দেখে একটু মায়া হ'ল | এককালে সেও তো ফ্যাক্টরির ভেঁপু শুনে কাজে যেত আর ফিরে এসে তাকে আর রেণুকে আদর করে গল্প শোনাত সারাদিন পাটকলে কি কি হয়েছে | শুনতে শুনতে চোখ বুজে আসত তার আর রেণুর |

সকালে হারানকে ঠেলে উঠিয়ে চিরকুটটা হাতে দিয়ে বলে গেল, 'সাতটার মধ্যে গিয়ে লাইনে দাঁড়াবে |' আর নিজে দৌড়াল ৪:৪৫-এর লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ধরতে |

৫

শুক্রবার ভোর ৫টা নাগাদ বেরনো, ফ্লাইট ধরতে হবে | অন্ধকার রাতের কুয়াশা চিরে হু হু করে উবের চলছিল নিউটাউনের ফাঁকা রাস্তা দিয়ে | আলো আঁধারিতে ল্যাম্পপোস্টগুলো দৌড়ে দৌড়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল জীবনের উড়ানের এক একটা মাইলস্টোনের মতো | কর্পোরেট জগতে প্রথম পদক্ষেপ থেকে আজ পর্যন্ত পদোন্নতি, ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততর হয়ে ওঠা কর্মজীবন আর দিন কে দিন রজতের সাথে দূরত্ব আর সম্পর্কের শীতলতা বাড়ার চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল রঞ্জনার মন | জানলার কাঁচটা নামিয়ে এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস ঢুকিয়ে নিয়ে ভোরের প্রথম আলো ফোটা দেখতে দেখতে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল রঞ্জনা |

৬:৫৫ Spice Jet কলকাতা-বেঙ্গালুরু ফ্লাইটের শেষ ঘোষণার পর যখন প্লেনে উঠল, দেখল সোমনাথ উদগ্রীব হয়ে বসে আছে তার আসার অপেক্ষায় | সোমনাথকে পেরিয়ে জানলার ধারের সিটে বসতে গিয়ে তার ওড়না ঢেকে দিল সোমনাথের মুখ | 'সরি' বলে ওর দিকে তাকাতে মনে হ'ল সোমনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস টেনে উপভোগ করল তার Coco Mademoiselle Eau De Perfume-এর গন্ধ |

ল্যাপটপ খুলে আলোচনা করে আজকের প্রেসেন্টেশনটার কয়েকটা জায়গা অদলবদল করা হ'ল | সোমনাথের গঠনমূলক সমালোচনা ভাল করার বা একটা নতুন কিছু করার প্রেরণা নিয়ে আসে |

বেঙ্গালুরু এয়ারপোর্টে নেমেই ছুটল Whitefield IT পার্কের উদ্দেশ্যে | ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত টানা মিটিং| রঞ্জনার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেসেন্টেশন আর সোমনাথের ব্যবসায়িক পরিকল্পনার উপস্থাপনায় ইন্ডিয়ার বিজনেস হেড আর লন্ডনের CEO দুজনেই খুশি | কাল MOU সই করা হবে | সামনের মাসে লন্ডনে গিয়ে সই হবে ফাইনাল কনট্র্যাক্ট |

কাছেই Four Point Sheraton হোটেলে চেক ইন করে ঘরে যাওয়ার আগে উচ্ছ্বসিত সোমনাথ বলল, আটটায় লবিতে মীট করো, ডিনার করতে যাব একসাথে | খুব ভোরে ওঠা আর সারাদিনের ধকলের ফলে স্নান সেরে বিছানায় পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ল রঞ্জনা | বারংবার টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভেঙে চোখ কচলে দেখে ৮:৩০ বাজে | কোনোরকমে একটা পালুজা পরে নেমে দেখে সোমনাথ পুল সাইডে বসে ড্রিঙ্কসে চুমুক দিচ্ছে | সরি বলে একটা চেয়ার টেনে সেও বসল সুইমিং পুলের ধারে | প্রিয় ককটেল, সোডা আর বরফ সহযোগে "ব্লাড অরেঞ্জ জুস, ক্যাম্পারি, জিন আর ভার্মাউথ"-এ চুমুক দিয়ে টুন্ডা কাবাবের নরম টুকরোতে কামড় বসাতেই মনটা খুশিতে ভরে গেল | সোমনাথও তার দেরিতে আসায় অভিমানের মেঘ সরিয়ে

স্বভাবসুলভ হাসি মস্করায় ভরিয়ে দিল সন্ধ্যেটা | হালকা সুরে বাজছিল আগ্রা ঘরানার বিদুষী দীপালি নাগের কণ্ঠে পূরবী রাগের খেয়াল | প্রিয় ককটেল, সঙ্গে সোমনাথের স্বতঃস্ফূর্ত গল্পকথার ফুলঝুরি, হাসি ঠাট্টা - কেমন একটা আবিষ্টতায় ভরে যাচ্ছিল রঞ্জনার মনটা | উঠে দাঁড়াতে গিয়ে একটু বেসামাল হতেই সামলে নিল সোমনাথ | ওর বাহুলগ্না হয়ে পায়ে পায়ে পৌঁছে গেল ডাইনিং হলে | হালকা নৈশভোজের পর ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে একটু প্রশ্রয়ের আশায় তৃষিত দৃষ্টিতে তাকাল সোমনাথ | রঞ্জনা 'আজ নয়' গোছের ভ্রূভঙ্গি করে ঢুকে গেল নিজের ঘরে |

সকালে কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট সেরে অফিস, MOU-এ সই করার পর সবার অভিনন্দন নিয়ে চড়ে বসল কলকাতার বিমানে | সোমনাথকে বড় আনমনা লাগছিল |

৬

হারান কাজ পাবে সেই আশায় ভারি উৎসাহ নিয়ে বাড়ি ফিরে মিনতি দেখল হারান চৌকাঠে শুকনো মুখে বসে আছে | আজ ছাইপাঁশ গিলতেও যায়নি | কী হ'ল জানতে চাইলেও কোনো উত্তর নেই | অনেক সাধাসাধির পর জানা গেল, সকাল ৭টা থেকে হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেও কোনো সুবিধা করতে পারেনি | স্থানীয় কমিটির নেতা, মস্তান যে যার লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে লাইনে | আর হারান চিরকুট হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেলা পার করে দিয়ে শুনেছে আজকের মতো লোক নেওয়া বন্ধ | কাল সকালে আবার লাইন দিতে হবে |

আজ পরপর তিনদিন হয়ে গেল হারানের যাওয়া আসার | এইভাবে হবার নয় বুঝে মিনতি কাজ থেকে ফেরার পথে গেল পার্টি অফিসে | এখনকার উঠতি নেতা, সাধন আর যাই হোক চোখের সামনে বড় হয়েছে | মিনতিকে মাসি বলেই ডাকে |

সব শুনে বলে, 'মাসি, যদি ক্যারম বোর্ড কিনতে হাজার পাঁচেক টাকা দাও তো হারানকে ঢুকিয়ে দিতে পারি কাজে |'

'আমি পাঁচ বাড়ি কাজ করে খাই, ৫ হাজার টাকা কোত্থেকে পাব? তুই বাবা কাজটা করিয়ে দে, আমি নাহয় চেয়েচিন্তে হাজার দুয়েক টাকা দেব তোদের ফিস্টি করতে |'

অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর সাধন মাসিকে নিয়ে চলল কনট্র্যাক্টরের সাইট অফিসে | সেখানে তখন দিনের শেষে চলছে মোচ্ছব | বাংলা মদের বোতল নিয়ে আসর সরগরম | সঙ্গে চলছে উচ্চৈঃস্বরে গান -

"বিড়ি জ্বালায় লে / জিগার সে পিয়া / জিগার মা বড়ি আগ হায়"

সাধন ঢুকে প্রথমেই গানটা বন্ধ করে দিল | রসভঙ্গ হতে সবার নজর গিয়ে পড়ল সাধন আর মিনতির দিকে | সর্দার গোছের লোকটা অর্ধমত্ত অবস্থায় মিনতির সারাদেহে চোখ বুলিয়ে বলল, 'কী সাধনবাবু কাকে লিয়ে এসেছেন, কোই ছোকরি ওকরি মেলেনি নাকি?'

সাধন কাছে গিয়ে ফিসফিস করে কী বলল জানি না , মনে হ'ল আপদ বিদেয় করে মোচ্ছবে মন দেওয়ার কথা বলল সে, 'ঠিক আছে কাল ভেজে দেবেন আপনার নাম করে, তবে আমাকেও একটু দেখবেন | গঞ্জের হাটে নয়া মাল কিছু এলে পাঠাবেন এখানে |'

বেরিয়ে এসে সাধন বলল, 'যাও মাসি, তোমার কাজ হয়ে গেল; তবে আমাদের টাকাটা পৌঁছে দিও পার্টি অফিসে |'

পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে হারানকে সুখবরটা দিল যে কাল কাজ সে পাবেই |

যাহোক দুটো খাবার মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ল মিনতি |

কাল আবার ৪:৪৫-এ লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ধরা আছে |

৭

শনিবার সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ঢুকল এয়ারপোর্ট থেকে, বাড়ির সব আলো নেভানো | বার কয়েক বেল দিতে অন্ধকারেই দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালো রজত | চিন্তিতমুখে জিজ্ঞাসা করতে, বলল, 'ফিউস উড়ে গেছে, মিস্তিরিকে খবর দেওয়া হয়েছে | যাহোক, সাবধানে ঘরে ঢুকে হ্যান্ড লাগেজটা রাখতে না রাখতে সব আলোগুলো একসাথে জ্বলে উঠল, আর চমকে দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার "হ্যাপি বার্থডে রঞ্জনা!"

রজতের অফিসের কলিগ নায়ার, সুসান আর আরো কয়েকজন আধচেনা পুরুষ আর মহিলাতে ঘর ভর্তি | অল্প একটু ডেকোরেশন আর কেক নিয়ে তৈরী বার্থডে পার্টি করবার জন্য | ভুলেই গিয়েছিল আজ তার জন্মদিন | মনে মনে একটু খুশিই হ'ল যে রজত মনে রেখেছে | একটু সময় নিয়ে ফ্রেশ হয়ে রজতের পছন্দের আসমানী রঙের জর্জেটের শাড়ি আর ম্যাচিং স্লীভলেস ব্লাউজ পরে হালকা প্রসাধন নিয়ে ড্রয়িং রুমে যখন ঢুকল ততক্ষণে পার্টি জমে গেছে | ঢুকতে না ঢুকতে মিস্টার নায়ারের নজরে পড়া, আর চিৎকার 'রঞ্জনা ম্যাডাম, শাড়িতে আপনাকে একদম এঞ্জেল লাগছে |' কেক কাটা আর শ্যাম্পেন খোলার পর পার্টি মুডে চলল হৈচৈ | সবার হাতে ড্রিঙ্কস, আর একজন সার্ভার ঘুরে ঘুরে সার্ভ করছিল পনীর, চিকেন আর

মাছের কাবাব | আজকাল ছোট ছোট হাউস পার্টিতেও ককটেল, কেটারিং আর পরিবেশন করার জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা আছে | রাত বাড়ার সাথে সাথে উঁচুস্বরে ওয়েস্টার্ন গান-বাজনার আওয়াজ আর হৈচৈ শুনতে শুনতে কিরকম হাঁপ ধরে গেল রঞ্জনার | এত ভিড়েও কেমন একা লাগছিল | নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বারান্দার এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ | আর দেখতে লাগল একের পর এক ড্রিংকস নিতে নিতে রজতের বেচাল হয়ে যাওয়া, সুসানের সাথে ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত আর অসংলগ্ন কথাবার্তা, আর নায়ারের সঙ্গে চাটুকারিতা | মনে হচ্ছিল তার জন্মদিনটা একটা নিমিত্ত মাত্র |

সার্ভারকে ইশারা করতে ড্রিংক সার্ভ করা বন্ধ হ'ল | আস্তে আস্তে অতিথিরা বিদায় নিতে শুরু করল | শেষ অতিথি সুসান আর নায়ারও বেরিয়ে গেল | রজতকে নিয়ে ডিনার করতে বসার চেষ্টা করতে সে অস্ফুট স্বরে হ্যাপি বার্থডে ডার্লিং বলে ডাইনিং টেবিলে এলিয়ে পড়ল, কোনরকমে তাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় পৌঁছে দিয়ে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়াল রঞ্জনা | আলোআঁধারি সুনসান রাস্তা, মাঝে মাঝে নৈঃশব্দ চিরে চৌকিদারের বাঁশির আওয়াজ আর রাতজাগা কুকুরের ডাক মিলেমিশে তৈরী হয়েছিল একটা অদ্ভুত পরিবেশ | জানে না কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, আনমনা হয়ে ভাবছিল আজ একই ছাতের তলায় থেকেও যেন দুই গ্রহের বাসিন্দা তারা | সম্বিৎ ফিরতে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল বিছানার দিকে |

৮

হারানের কাজটা শেষ পর্যন্ত হয়েই গেল | মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে জোর কদমে | মিনতি দু'একটা বাঁধা পুরনো বাড়ি ছাড়া আর কাজ করে না | ধপধপি স্টেশন মোড়ে রাস্তায় বসা বাজারে বিকেলের দিকে বাসি সবজিগুলো বেশ সস্তায় বেচে দেয় | ট্রেন থেকে নেমে রোজ কিছু না কিছু কিনে নিয়ে সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি এসে একটু রান্না বসায় মিনতি | পাড়ার একটা মাধ্যমিক পাস ছেলেকে রেখেছে রেণুর পড়াশোনা একটু দেখিয়ে দেওয়ার জন্য | সারাদিন ইঁট ভাঙার কাজ করে গায়ে লাল ইঁটের ধুলো মেখে যখন হারান ফেরে, তাকে চানের জল এগিয়ে দেয় | সর্ষের তেল, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ দিয়ে এক বাটি মুড়ি মেখে রাখে সারাদিন খাটা-খাটনি করে আসা মানুষটার জন্য | চটকলে কাজ করার দিনগুলোর মতো আবার হারান গল্প করে - সারাদিনে কোন মজুরকে সর্দার গালি দিয়েছে, ছোকরা ওভারসিয়ারের নজরে পড়ার জন্য কোন কামিন ঢলাঢলি করছে, কোন পশ্চিমা মজুরের বৌ জমজ বাচ্চা বিইয়েছে – এইসব | মিনতি গোগ্রাসে গিলতে থাকে গল্পগুলো | সপ্তাহের শেষে মজুরি নিয়ে যখন ফেরে হারান রেণুর জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসে হাতে করে | একটা সপ্তাহ একটু বেশিকরে কাজ করতে হয়েছিল, কিছু বেশি মজুরি পেয়ে মিনতির জন্য একটা ডুরে শাড়িও কিনে এনেছিল |

বেশ ভালই কাটছিল – এক'দু মাস | একদিন সপ্তাহের শেষে মজুরির দিন সন্ধ্যে পেরিয়েও হারান না আসায় মিনতি একটু চিন্তায় পড়ে গেল | বেশ দেরিতে যখন ঘরে ঢুকল হারান, তার মুখে দেশি মদের গন্ধ | 'আবার ছাইপাঁশ গিলতে শুরু করেছ?' চিল-চিৎকার করে উঠল মিনতি | হারান জড়ানো গলায় বলল, 'আজ খাটাখাটনির পরে একটু ফুর্তি করার সখ হয়েছিল, তাই আরকি একটু গলা ভিজিয়েছি |

গজ গজ করতে করতে মিনতি খাবার বেড়ে দিল আর নিজেও খেতে বসল | রেণু আগেই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে |

একদিনের ব্যাপারটা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল | হাতে মজুরির পয়সা পেলেই হাড়িয়ার ঠেকে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে ফেরে হারান | কিছু বলতে গেলে নেশার ঘোরে চিৎকার করে বলে, 'তোর বাপের পয়সায় খাচ্ছি মাগী? আমি আমার গতরখাটা পয়সায় ফুর্তি করছি তো বেশ করছি |' আজকাল ঘরে পয়সা দেওয়াও কমে গেছে | হারানের মদ খাওয়ার বদলে মদই হারানকে খেতে শুরু করল | হাড়িয়ার ঠেকের মাসির চটুল কথায় মজে হাতের সব পয়সা উড়িয়ে যখন বাড়ি ফেরে তখন আর দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকে না তার | মিনতি আবার ভাবতে থাকল দু'এক বাড়ির কাজ ধরবে কিনা | রেণুটাকে মানুষ করতে হবে তো!

৯

কাজের চাপ দিনকে দিন বেড়েই চলেছে অফিসে | তার মধ্যে আবার গুজব চলছে কোম্পানি নাকি বিক্রি হয়ে যাবে কোনো বিদেশী ইনভেস্টরের কাছে | কাজের মধ্যে রোজই একটা কাল্পনিক আলোচনা চলছে, কোম্পানি হাত বদল হলে কার চাকরি যাবে আর কার প্রমোশন হবে তাই নিয়ে |

বিকেলে সোমনাথ রঞ্জনার ডেস্কে এসে বলল, 'সেক্টর ফাইভে নতুন গ্রিল বার খুলেছে আমার বন্ধু, অনেকদিন যেতে বলছে,

আজ একটু ঘুরে যাই চলো, একটু আলোচনাও আছে তোমার সাথে।'

সারাদিনের এই বদ্ধ অফিস পরিবেশ আর গুজবের দুনিয়া থেকে একটু নিষ্কৃতি ও চাইছিল রঞ্জনা।

মিনিট দশেকের মধ্যেই কাজ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ল সোমনাথের সঙ্গে। ঝকঝকে তকতকে গ্রিল বারের আলোআঁধারি এক কোণের টেবিলে বসে একটা ককটেল নিল রঞ্জনা, আর সোমনাথ নিল একটা ডবল ব্ল্যাক হুইস্কি, সঙ্গে এল কাবাব প্ল্যাটার। কিছুক্ষণের জন্য অফিসের কথা ভুলে গিয়ে সদ্য ঘটে যাওয়া আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল নিয়ে আলোচনা চলল। হঠাৎ আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে সোমনাথ তার দিকে তাকিয়ে বলল,

'আমি চলে যাচ্ছি রঞ্জনা; কাল রেসিগনেশন দেব।'

খবরটার আকস্মিকতায় একটু বিহ্বল হয়ে গেল রঞ্জনা। সামলে নিয়ে কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা কাটিয়ে সোমনাথের দিকে তাকাতে সে বলতে লাগল সিঙ্গাপুরে কোনো এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তাকে অফার করেছে সাউথ ইস্ট এশিয়া বিসনেস হেড হওয়ার জন্য। আর এই কোম্পানিরও যা টালমাটাল অবস্থা চলছে, না করতে পারেনি সোমনাথ।

তারপরেই টেবিলের উপর রঞ্জনার হাতে হাত রেখে বলল, 'তুমিও চলো রঞ্জনা, তোমার পসিশনেও ওদের লোক দরকার। তোমার Resume-টা শুধু পাঠাও, বাকি ব্যবস্থা আমি করব।'

'না সোমনাথ, সংসার ছেড়ে, রজতকে ছেড়ে আমার যাওয়া সম্ভব নয়।' কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে পড়ল রঞ্জনা, বাড়ি ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি।

১০

মাঝে কতদিন বিকেলের কাজটা ছেড়েই দিয়েছিল মিনতিমাসি। সকালেই যতটা পারে কাজ মিটিয়ে দিয়ে যেত। আজ অনেকদিন পরে রবিবার বিকেলে যখন কাজে ঢুকল, রঞ্জনার মনে হ'ল মাসির বয়সটা হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে। হাতের কাজ গুছিয়ে নিয়ে আজ কাছে এসে বসল মিনতিমাসি। কেন জানি না, তার ফেরার কোনো তাড়া দেখল না আজ। রঞ্জনার কিরকম মায়া হ'ল মাসির শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে। নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী মাসি, বেশ তো তুমি বলছিলে সংসার গুছিয়ে ফেলেছ আর কাজও কমিয়ে দিয়েছ, আর গালাগালিও কম করতে আজকাল, কী হ'ল আবার, ফিরে এসেছ কাজে?'

'আমার আর সংসার বলে কিছু নেই বৌদি', বলে ভেঙে পড়ল মাসি। রেণুর বাপ পড়ে থাকছিল রাত'ভর চুল্লুর ঠেকে, সব পয়সা ওড়াচ্ছিল ঠেকের ঢলানি মাগীটার পেছনে। কাল যখন বাড়ি এল ভোররাতে তখন আর পা দিতে দিইনি ঘরের চৌকাঠে। দেখো বৌদি, আমি একাই কাজ করে মানুষ করব রেণুকে।

চোখ মুছতে মুছতে মাসি যখন বেরিয়ে গেল মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে রইল রঞ্জনার।

রজতও আজকাল বাড়ি আসে গভীর রাতে। কানে আসে বেশিরভাগ সময় কাটায় সুসানের ফ্ল্যাটে।

দিনকে দিন শীতল সম্পর্কটা যেন শ্বাস রোধ করে আনছে। বাইরে ঘন অন্ধকার চিরে বিদ্যুৎ চমক আর বজ্রপাতের আওয়াজ চমকে দিল রঞ্জনাকে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়তে দেখে চলে গেল বারান্দার কোণে, জলের ঝাপটায় ভিজতে লাগল রঞ্জনা। দূরের ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলোও আর আলো দিতে পারছিল না বৃষ্টির তোড়ে। ভিজতে ভিজতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ার আওয়াজের মধ্যে রঞ্জনার অবচেতন মনে অনুরণিত হচ্ছিল অখ্যাত এক কবির কবিতার শেষ কটা লাইন,

"পথ চলতে চলতে
রুক্ষ বাস্তবের উত্তাপে,
জানি না কখন উধাও হ'ল
কুয়াশার আলোয়ান।
নিরাশার অন্ধকারে
খুঁজতে থাকলাম
তোমার আঙুলগুলো।
কোথাও না পেয়ে
ফিরে গেলাম অন্ধগলিতে,
দেখলাম গলে গেছে
জমাটবাঁধা ভালবাসা।
পড়ে আছে শুধু
শুকিয়ে যাওয়া
চোখের জলের দাগ!"

সম্বিৎ ফিরতে ঘরে এসে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে বার করল ল্যাপটপ। Resume-টা পাঠিয়েই দিল সোমনাথকে।

একুশে এপ্রিল ৯জন কবিদের নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি সংকলিত কাব্যগ্রন্থ "এক মুঠো রোদ্দুর"।
এই ৯জনের মধ্যে একজন আমাদের পাঠচক্রের সভ্য, সফিক আহমেদ।

সফিক আহমেদ ও পাখি আমাদের পাঠচক্রের নতুন সভ্য। প্রথম দিন থেকেই সফিক তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ও ভাষার মাধুর্যে সকলের মনে সাড়া জাগিয়েছেন।
সফিকের সফলতায় আমরা আনন্দিত, তাঁকে আমাদের পাঠচক্রের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

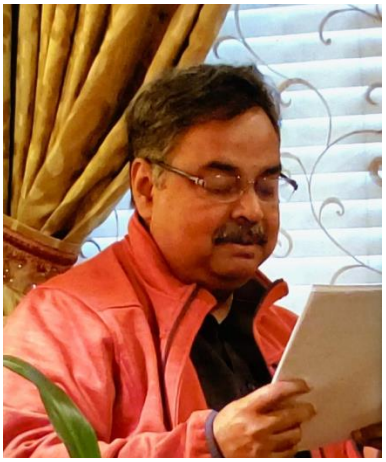

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা ১৪২৬ (2019)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হবে।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। ওয়ার্ড-এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
7614 Westmoreland Drive
Sugar Land, TX 77479
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২০ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই ও বাংলা ছায়াছবির ডিভিডি আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

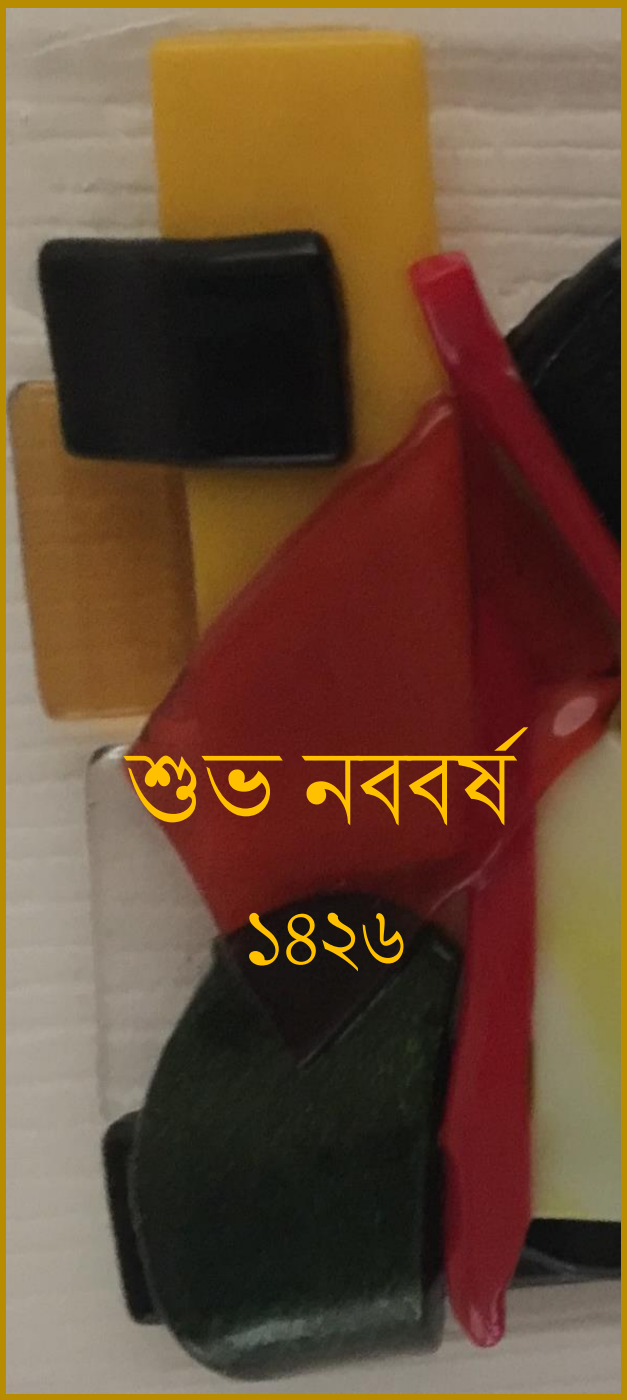
শুভ নববর্ষ
১৪২৬